মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/৭ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
❑ জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *- মুযাফফর বিন মুহসিন* ১৭
❑ মানবজাতির প্রতি ফেরেশতাদের দো'আ ও অভিশাপ *-মুহাম্মাদ আবু তাহের* ২৪
❑ সর্বনাশের সিঁড়ি ৩১
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৫
♦ **হিমালয়কেন্দ্রিক বাঁধ : বাংলাদেশে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা** *-মুনশী আব্দুল মান্নান*
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৮
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৪০
✡ **ক্ষেত-খামার :** ৪১
♦ দোতলা কৃষি পদ্ধতি
♦ মৌমাছি পালন পদ্ধতি
✡ **কবিতা :** ৪২
♦ একুশের চেতনা ♦ আহ্বান
♦ ভাঙ্গরে যুবক এই সমাজ ♦ পর্দায় ঘৃণা
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **মতামত** ৫০
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫১

সম্পাদকীয়

শেয়ার বাজার

১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজার কেলেংকারির পর ২০১০-১১ সালে পুনরায় কেলেংকারি ঘটল। সেবারের কেলেংকারিতে ২০০ কোটি টাকার মত লোপাট হলেও এবার হয়েছে ১৫ হাযার কোটি টাকার উপর। যার রেশ এখনো চলছে। সর্বস্ব হারিয়েছে প্রায় ৪০ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। চলছে হাযার হাযার মানুষের আর্তনাদ-আহাজারি। কিন্তু নেপথ্য নায়করা থাকছে পূর্বের ন্যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের টিকিতে হাত দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। কেননা শেয়ার বাজার মূলতঃ পুঁজিপতিদের সৃষ্টি। আর বর্তমান সংসদের অধিকাংশ এমপি-ই হলেন পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। সেকারণ অনেকেই এ সংসদকে ব্যবসায়ীদের ক্লাব বলেন। যাই হোক শেয়ার ব্যবসাটা কি, এ ব্যবসা শরী'আতে বৈধ কি-না, এ ব্যবসায়ে জনগণের কল্যাণ বা অকল্যাণ কতটুকু- এগুলিই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামে ব্যবসা হালাল ও সূদ হারাম। যৌথ ব্যবসার দু'টি নীতিই ইসলামে বৈধ। আর তা হ'ল মুযারাবা ও মুশারাকাহ। প্রথমটি হ'ল, একজনের টাকা ও অন্যজনের শ্রম। যেমন খাদীজার ছিল সম্পদ ও রাসূলের ছিল শ্রম। দ্বিতীয়টি হ'ল শরীকানা ব্যবসা। যাতে উভয়ে সম্পদ ও শ্রমে আনুপাতিক অংশীদার হবে। দু'টি ব্যবসাতেই লাভ-ক্ষতির অংশীদার উভয় পক্ষ হবে। এ দুই নীতির বাইরে ব্যবসায়ের যত পথ-পদ্ধতি আধুনিক যুগে বের হয়েছে, প্রায় সবগুলিই পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়ানোর অপকৌশল মাত্র। যা তাদেরই স্বার্থে তাদেরই নিয়োজিত অর্থনীতিবিদদের সৃষ্টি। আর শেয়ার বাজার তো আসলে কোন বাজারই নয়। এ এমন একটি বাজার যেখানে কোন মাল নেই, দোকান নেই। আছে কেবলই ক্রেতা। যাদের নযর থাকে কেবলই টিভি-কম্পিউটারের রূপালি পর্দার দিকে। শেয়ার বেচাকেনাকে কোম্পানীর অংশের বেচাকেনা ধরে নিয়ে একে বৈধতার সনদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান শেয়ার বাজার এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বেচাকেনা হ'লেও কোম্পানীর লাভ-লোকসান বা বাস্তব অবস্থার সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। শেয়ারকে কেন্দ্র করে মূলতঃ গড়হবু-মধসব-ই হচ্ছে শেয়ার বাজারের মূল ধারা। এখন শেয়ার ব্যবসা করার জন্য নিজের টাকা লাগে না। এজন্য মার্চেন্ট ব্যাংক হয়েছে। এরা কিন্তু মালের মার্চেন্ট নয়। বরং টাকার মার্চেন্ট। অর্থাৎ আপনি এদের কাছে শেয়ার বন্ধক দিয়ে যত টাকা খুশী নেবেন। বিনিময়ে এদের সূদ দিবেন। এদের উপস্থিতিতেই আপনি শেয়ার বিক্রি

করবেন। আপনার লোকসান হলেও এদের লাভ ঠিক-ই থাকবে। শেয়ার বাজারের গতি নির্ধারণে এই সব ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। এরা জাহেলী যুগের আবু জাহল, উবাই ইবনু খালাফ ও বৃটিশ যুগের মাড়োয়ারী-কাবুলীওয়ালাদের মত।

মার্চেন্ট ব্যাংকের মত রয়েছে মিউচুয়াল ফাণ্ড। এদের অন্য কোথাও ব্যবসা নেই। এরা স্রেফ শেয়ারের ব্যবসা করে। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারই এদের পুঁজি। আর তা হচ্ছে লিকুইড মানি-র মত। যেকোন সময় তা মার্কেটে বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা পেতে পারেন। কমবেশী যাই-ই পাক, সবটাই তাদের লাভ। এক কথায় বলা যায় এগুলি ভদ্র নামের আড়ালে স্রেফ ফটকাবাজারী। আরেকটি গ্রুপ কাজ করে হুজুগ লাগানোর জন্য। তারা ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের অতি মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করে। রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে শেয়ার কিনতে প্রলুব্ধ করে। তারপর তাদের টাকাগুলো শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ হলেই তা লোপাট করে এই গোষ্ঠী সরে পড়ে। কিন্তু তারা থাকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে। যেমন সঊদী যুবরাজ রূপালী ব্যাংক কিনবেন বলে সংবাদ এল। অমনি প্রতারক চক্র সজাগ হ'ল। ফলে অচল রূপালী ব্যাংকের ১০০/- টাকার শেয়ার সচল হয়ে ৩০০০/- টাকার উপরে উঠে গেল। পরে যুবরাজ যখন কিনলেন না, তখন শেয়ারে ধস নামল। বহুলোক ফতুর হ'ল। এখন শেয়ার বাজার নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্কেটে পরিণত হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামটাই কেবল ব্যবহৃত হয়। কোম্পানীর ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন সম্পর্ক এখন আর অবশিষ্ট নেই।

যদিও এগুলি রোধ করার জন্য এসইসি-র ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তারা সবক্ষেত্রে সফল হতে পারেন না। যেমন বর্তমানে পারছেন না। কারণ পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি-র নেই। নীতিবান কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হলে তাকে হয় সরে দাঁড়াতে হবে, নয় ম্যানেজ্ড হ'তে হবে। নেপথ্যের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাদের কাজ নয়। হ্যাঁ, সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দলীয় সরকার সর্বদা বিরোধী দলের উপরে দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা জুয়ার মধ্যে পড়ে কি-না। উত্তরে বলা চলে যে, কোম্পানীর শেয়ার খরিদ ও তার লাভ-লোকসানের ভাগীদার হওয়ার বিষয়টি আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটা আপনি পাবেন বছর শেষে কোম্পানী যখন তার লভ্যাংশ ঘোষণা করবে তখন। অথচ শেয়ার মার্কেট ওঠা-নামা করে মিনিটে-মিনিটে। নাম ব্যবহার করা হয় কোম্পানীর। তাহ'লে এটা কোন পর্যায়ে পড়বে? নিঃসন্দেহে এটি জুয়া খেলার মত। অতএব হারামের দরজা বন্ধ করাই ইসলামী ফিক্বহের অন্যতম প্রধান মূলনীতির দিকে তাকালে প্রচলিত শেয়ার ব্যবসাকে হারাম বলা ভিন্ন উপায় নেই। সাথে সাথে সম্পূরক প্রশ্ন এটাও চলে আসে যে, যদি কেউ বার্ষিক লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ট পাবার আশায় কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করে, তাহ'লে সেটা জায়েয হবে কি?। উত্তরে বলা যায় যে, যদি ঐ কোম্পানীর মূলধনে ও লেনদেনে কোথাও সূদ মিশ্রিত না থাকে, অর্থাৎ সূদী ঋণ না থাকে এবং ব্যবসায়ে ও বিনিয়োগে ফটকাবাজারি ও হারাম মিশ্রিত না থাকে, তাহ'লে আপনি সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু হাযারো শরীকানার ঐ ব্যবসায়ে কে আপনাকে ঐ নিশ্চয়তা দিবে? তাছাড়া এরূপ কোম্পানীর অস্তিত্ব এদেশে আছে কি? সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়াই রাসূলের নির্দেশ এবং তা মেনে চলাই মুমিনের নাজাতের পথ। তাই জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য বর্তমান অর্থনীতিতে শেয়ার মার্কেটে প্রবেশ করা আদৌ বৈধ হবে না। কারণ- (১) এতে ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না কী বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন *(বুঃ মুঃ)*। (২) যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা দেখা ও জানা-বুঝার সুযোগ এখানে থাকে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন *(মুসলিম)*। (৩) শেয়ার ব্যবসার পণ্য আয়ত্তে নিয়ে আসার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম)*। (৪) শেয়ার ব্যবসা একটি জুয়া মাত্র। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মাল দেখে না। অথচ অনবরত দর উঠা-নামা করে। (৫) শেয়ার ব্যবসায় ফটকাবাজারীর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় কোম্পানী তার প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে। কখনো কারখানা তৈরি না করেই তার শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়। কোনরূপ ব্যবসা বা মালামাল ছাড়াই তারা এ লাভ করে থাকে। এছাড়াও নিত্যনতুন ছলচাতুরী শেয়ারবাজারে যুক্ত হচ্ছে। (৬) এতে সূদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ার ব্যবসা ব্যাংক থেকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে। ফলে এতে দুনিয়া ও আখেরাতে জনগণের কোন কল্যাণ নেই। অতএব শেয়ার ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে আমরা বলব, এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। তাদের নির্বাচিত সরকার মুসলমান। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে। তাহ'লে কেন এদেশে সূদ ও জুয়ার মত হারাম বস্তু যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে? যারা রাজনীতি ও অর্থনীতির দায়িত্বশীল পর্যায়ে আছেন, তাদেরকে আমরা আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং হারাম থেকে তওবা করে হালাল রূযীর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/৮ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

(২য় অধ্যায়)

মাদানী জীবন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।-

এক. ১লা হিজরী সনের ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার হ'তে ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা'দ মাসে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর। এই সময় কাফের ও মুনাফিকদের মাধ্যমে ভিতরে ও বাইরের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র হামলা সমূহ সংঘটিত হয়। ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য এ সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৪৮টি বড় ও ছোটখাট অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত ও অভিযান পরিচালিত হয়।

দুই. মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি চলাকালীন সময়। যার মেয়াদকাল ৬ হিজরী থেকে ৮ হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় দু'বছর। এই সময়ে প্রধানতঃ ইহুদী ও তাদের মিত্রদের সাথে বড়-ছোট ২১টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তিন. ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর থেকে ১১ হিজরীতে রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত তিন বছর। এই সময়ে দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। চারদিক থেকে গোত্রনেতারা প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদেশী রাজন্যবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। এই সময়ে মানাত, উযযা, সুওয়া' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময় হোনায়েন যুদ্ধ এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমন সহ বড়-ছোট ১৩টি অভিযান পরিচালিত হয়। এভাবে মাদানী জীবনের ১০ বছরে ছোট-বড় ৮২টি যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে ইসলাম রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে এবং তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি সমূহকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকার মত শক্তিশালী অবস্থানে উপনীত হয়।

এক্ষণে আমরা রাসূলের মদীনায় হিজরত কালীন সময়ে মদীনার সামাজিক অবস্থা ও সে প্রেক্ষিতে রাসূলের গৃহীত কার্যক্রম সমূহ একে একে আলোচনা করব।-

মদীনার সামাজিক অবস্থা :

মক্কা ও মদীনার সামাজিক অবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কার সমাজ ব্যবস্থাপনায় কুরায়েশদের একক প্রভুত্ব ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ মূর্তি পূজারী ছিল। যদিও সবাই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। হজ্জ ও ওমরাহ করত। ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপরে তারা কায়েম আছে বলে নিজেদেরকে 'হানীফ' (حنيف) বা 'একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ'তে বিশ্বাসী' বলে দাবী করত। বিগত নেককার লোকদের মূর্তির অসীলায় তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতো। এই অসীলাপূজার কারণেই তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়েছিল। তারাও রাসূলের প্রচারিত নির্ভেজাল তাওহীদকে তাদের কপট ধর্ম বিশ্বাস ও দুনিয়াবী স্বার্থের বিরোধী সাব্যস্ত করে রাসূলের ও মুসলমানদের রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল। মক্কায় তারা ছিলেন দুর্বল ও মযলূম এবং বিরোধী কুরায়েশ নেতারা ছিলেন প্রবল ও পরাক্রমশালী।

পক্ষান্তরে মদীনায় সমাজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারু একক কর্তৃত্ব ছিল না। ধর্মীয় দিক দিয়েও তারা এক ছিল না বা বংশধারার দিক দিয়েও এক ছিল না। ইহুদীদের চক্রান্তে আউস ও খাযরাজের মধ্যে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলে আসছিল। সর্বশেষ বু'আছের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে ধ্বংসকারী। যার পরেই তাদের আমন্ত্রণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা মদীনাবাসীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, তাঁর আগমনের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটবে। ১১ নববী বর্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ্র নেতৃত্বে ৬ জন ইয়াছরেবী যুবকের ইসলাম গ্রহণের সময় তারা এই আশাবাদই ব্যক্ত করেছিল।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়াছরিবে এই সময় মূলতঃ দু'দল লোক বসবাস করত। একদল ছিল ইয়াছরিবের আদি বাসিন্দা পৌত্তলিক মুশরিক সম্প্রদায়। যারা প্রধানতঃ আউস ও খাযরাজ দু'গোত্রে বিভক্ত ছিল। যাদের মধ্যে যুদ্ধ ও হানাহানি লেগেই থাকত। আউসদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন খাযরাজ গোত্রভুক্ত। এরা ছিল বিশুদ্ধ আরবী ভাষী।

দ্বিতীয় ছিল ইহুদী সম্প্রদায়। খৃষ্টানরা যাদেরকে মেরে-কেটে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা শেষনবীর আগমনের অপেক্ষায় এবং তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার আকাংখায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল বহুদিন পূর্বে। এরা ছিল হিব্রুভাষী। কিন্তু পরে আরবী ভাষী হয়। এদের

প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল তিনটি : (১) বনু ক্বায়নুক্বা‘ (২) বনু নাযীর ও (৩) বনু কুরায়যা। এরা মদীনার উপকণ্ঠে তৈরী স্ব স্ব দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহে বসবাস করত। দক্ষ ব্যবসায়ী ও সূদী কারবারী হওয়ার কারণে এরা ছিল সর্বাধিক সচ্ছল। চক্রান্ত , ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এরা আউস ও খাযরাজের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখতো এবং ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ নীতির মাধ্যমে উভয় গোত্রের উপরে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতো। এই সূক্ষ্ম পলিসির কারণে তাদের বনু ক্বায়নুক্বা‘ গোষ্ঠী খাযরাজদের মিত্র ছিল এবং বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোষ্ঠী আউসদের মিত্র ছিল। আসলে তারা উভয়ের শত্রু ছিল। তাদেরকে তারা সূদী ঋণ ও অস্ত্র ব্যবসার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। তারা এভাবে আরবদের শোষণ করত এবং তাদের মূর্খতার প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ ‘মূর্খদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই’ *(আলে ইমরান ৩/৭৫)*। অর্থাৎ মূর্খদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার বিনষ্ট করায় আমাদের কোন পাপ নেই। বর্তমান বিশ্বের ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শ্লোগানের আড়ালে উন্নয়নশীল ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের শোষণ-নির্যাতন, সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসা পূর্বের ন্যায় বজায় রেখে চলেছে। ভূগর্ভের তৈল লুট করার জন্য তারা ভূপৃষ্ঠের মানুষের রক্ত পান করছে গোগ্রাসে। কিন্তু এই রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারদের রক্ত নেশা মিটছে না।

সেই সময় ইয়াছরিবে পৌত্তলিক মুশরিক ও ইহুদীদের বাইরে কিছু সংখ্যক খৃষ্টানও বসবাস করত। যারা ইহুদীদের ন্যায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল শেষনবীর আগমন প্রত্যাশায়। ইহুদীরা ভেবেছিল, শেষনবী হযরত ইসহাকের বংশে হবেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিগত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। তারা ইয়াছরিবের লোকদের হুমকি দিত এই বলে যে, سيخرج نبى آخر الزمان فنتبعه ونقتُلكم معه قتل عاد وإرم ‘শেষ যামানার নবী সত্বর আগমন করবেন, আমরা তাঁর অনুসারী হব এবং তোমাদের হত্যা করব (বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি) ‘আদ ও ইরমের ন্যায়’।[১] কিন্তু হযরত ইসমাঈলের বংশে শেষনবীর আগমন ঘটায় এবং তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ) উভয়ের সত্যায়ন করায় ইহুদীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা ভেবেছিল যে, শেষনবী এসে তাদের লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের কথিত ত্রিত্ববাদ, ঈসার পুত্রত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ববাদ, সন্যাসবাদ ও পোপের ঐশী নেতৃত্ববাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু এসবের বিপরীত হওয়ায় তারাও রাসূলের বিরোধী হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, ইহুদী ও নাছারা কারু মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কোনরূপ সংগ্রামী চেতনা ছিল না। ধর্মের প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত, সেটা ছিল জাদু-টোনা, ঝাঁড়-ফুঁক, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ ও অনুরূপ আরও কিছু ক্রিয়া-কর্ম। এ সকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী-গুণী এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও নেতা মনে করত।

চতুর্থ আরেকটি উপদল গড়ে উঠেছিল খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূলের নেতৃত্বে। বু‘আছ যুদ্ধের পরে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলে তাকে নেতা নির্বাচিত করে। এজন্য তারা রাজমুকুট তৈরী করে এবং এই প্রথমবারের মত উভয় গোত্র একত্রিত হয়ে তাকে রাজ আসনে বসাতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে রাসূলের আগমন ঘটে এবং উভয় গোত্র তাকে ছেড়ে রাসূলকে নেতারূপে বরণ করে। এতে আব্দুল্লাহ ও তার অনুসারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের সকল ক্ষোভ গিয়ে জমা হয় রাসূলের উপরে। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না দেখে তারা চুপ থাকে এবং বছর দেড়েক পরে বদর যুদ্ধের পর হতাশ হয়ে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়। তবে আদি বাসিন্দা আউস ও খাযরাজদের অনেকে পূর্বেই ইসলাম কবুল করায় এবং তারাই রাসূলকে ও মুহাজিরগণকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রয় দেওয়ায় অন্যেরা সবাই চুপ থাকে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

উপরোক্ত চারটি দল তথা (১) পৌত্তলিক মুশরিক আউস-খাযরাজ, (২) ইহুদী, (৩) নাছারা ও (৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের গ্রুপের গোপন বিরোধিতা ছাড়াও মুহাজির মুসলমানগণের নানাবিধ সমস্যা মুকাবিলা করা রাসূলের জন্য বলতে গেলে জ্বলন্ত সমস্যা ছিল। তবে মুহাজিরদের সমস্যা আনছাররাই মিটিয়ে দিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে মক্কা থেকে কোন মুহাজির মুসলমান এলেই তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিত মদীনার নবদীক্ষিত আনছার মুসলমানগণ। ফলে মুহাজিরগণের সমস্যা ছিল পজেটিভ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের সমস্যা ছিল নেগেটিভ। যা সর্বদা রাসূলকে চিন্তাগ্রস্ত করে রাখতো।

নবতর বয়কট :

উপরোক্ত সমস্যাবলীর সাথে যোগ হয়েছিল আরেকটি কঠিন সমস্যা। সেটা ছিল মক্কার মুশরিকদের অপতৎপরতা। তারা মুহাজিরদের ফেলে আসা বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পত্তি

১. *আর রাহীক্ব ১৩৫।*

জবরদখল করে নিল। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বন্দী ও নির্যাতন করতে লাগল। অধিকন্তু তাদের ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের উস্কানি দিতে লাগল, যাতে মদীনায় খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে মদীনায় জিনিষপত্র আমদানী হ্রাস পেতে থাকল। যা মক্কার মুশরিকদের সাথে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে ফেলল।

মাক্কী ও মাদানী জীবনের প্রধান পার্থক্য সমূহ :

মাক্কী ও মাদানী জীবনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কায় জন্মস্থান হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানগণ সেখানে ছিলেন দুনিয়াবী শক্তির দিক দিয়ে পরাজিত ও নির্যাতিত। পক্ষান্তরে মাদানী জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হাতে। এখানে বিরোধীরা ছিল নিষ্প্রভ। ফলে মদীনার অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে ইসলামকে পূর্ণতা দানের সুযোগ আসে। আর সেকারণেই ইসলামের যাবতীয় হারাম-হালাল ও আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান একে একে মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয় ও তা বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পূর্ণতার সনদ হিসাবে আয়াত নাযিল হয়- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا، 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহাজ্জ তারিখ শুক্রবারে বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় আরাফা ময়দানে অবস্থানকালে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাত্র ৮১ দিন পরে ১১ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবারে মদীনায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিলের পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন মূলক মাত্র কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এভাবে আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে সত্য দ্বীন নাযিল হওয়ার যে সিলসিলা জারি হয়েছিল, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মদীনায় তার সমাপ্তি ঘটে এবং আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

ইহুদীদের কপট চরিত্র :

হিজরতের পূর্ব থেকেই ইহুদীরা মক্কায় রাসূলের আবির্ভাব সম্পর্কে জানত। এখন যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে এলেন এবং মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন করলেন। যার ফলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও হিংসা-হানাহানিতে বিপর্যস্ত ইয়াছরিবের গোত্র সমূহের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক ক্রমেই উষ্ণ-মধুর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকল, তখন তা ইহুদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাদের আশংকা হ'ল যে, এইভাবে যদি সবাই মুসলমান হয়ে যায় ও আপোষে ভাই ভাই হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের 'বিভক্ত কর ও শাসন-শোষণ কর' নীতি মাঠে মারা যাবে। এর ফলে তাদের সামাজিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। সাথে সাথে ইসলামে সূদ হারাম হওয়ার কারণে তাদের রক্তচোষা সূদী কারবার একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যা তাদের পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ধ্বস নামাবে। এমনকি চক্রবৃদ্ধি হারে ফেঁপে ওঠা সূদের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অত্যাচারমূলক চুক্তির ফলে ইয়াছবির বাসীদের যে বিপুল ধন-সম্পদ তারা কুক্ষিগত করেছিল, তার সবই তাদেরকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হ'তে হবে। ফলে তারা রাসূলের বিরুদ্ধে গোপনে শত্রুতা শুরু করে দেয়। পরে যা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। তাদের কপট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ রাসূলের মদীনায় পদার্পণের প্রথম দিনেই ঘটে। নিম্নের দু'টি ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।-

দু'টি দৃষ্টান্ত :

(১) ইহুদী নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব সম্পর্কে তার কন্যা ছাফিয়াহ যিনি পরবর্তীতে রাসূলের স্ত্রী হয়ে উম্মুল মুমেনীন রূপে বরিত হন, তিনি বলেন, আমি আমার বাপ-চাচাদের নিকটে তাদের সকল সন্তানের মধ্যে অধিক প্রিয় ছিলাম এবং সকলের আগেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তারা আদর করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম ইয়াছরিবে আগমন করেন ও ক্বোবায় বনু আমর বিন আওফের গোত্রে অবতরণ করেন, সেদিন অতি প্রত্যুষে আমার পিতা ও চাচা রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন। অতঃপর সন্ধ্যার দিকে তারা ক্লান্ত ও অবসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আমি ছুটে তাদের কাছে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ্র কসম তারা এত চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এ সময় আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম তিনি আমার আব্বাকে বলছেন, أهو هو؟ 'ইনিই কি তিনি? আব্বা বললেন, نعم والله 'আল্লাহ্র কসম, ইনিই তিনি'। চাচা বললেন, فما في نفسك منه 'এখন তাঁর সম্পর্কে আপনার

চিন্তা কী'? আব্বা বললেন, عداوتُه والله ما بقيـــتُ 'স্রেফ শত্রুতা। আল্লাহ্র কসম যতদিন আমি বেঁচে থাকব'।

উল্লেখ্য যে, ইহুদী আলেম ও সমাজনেতাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَوْ آمَنَ بِىْ عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَآمَنَ بِى الْيَهُوْدُ، رواه البخارى عـــن ابى هريـــرة– 'যদি আমার উপরে দশজন ইহুদী নেতা ঈমান আনত, তাহ'লে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় আমার উপরে ঈমান আনতো'।[২] ছোট ভাই আবু ইয়াসের ইবনে আখত্বাব লোকদের বলল, أطيعونى فان هذا هو النبى الذى كنـــا ننتظـــر– 'তোমরা আমার অনুসরণ কর। কেননা ইনিই সেই নবী আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম'। কিন্তু বড় ভাই হুয়াই বিন আখত্বাব বিরোধিতা করায় সাধারণ ইহুদীরা ইসলাম কবুল করা হ'তে বিরত থাকে।[৩] এতে বুঝা যায় যে, সমাজনেতা ও আলেমগণের দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব তাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য।

(২) **আব্দুল্লাহ বিন সালাম-এর অনুসারীগণ :** ক্বোবার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইয়াছরিবে বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করেন, তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তিনি রাসূলকে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যা নবী ব্যতীত কারু পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রাসূলের নিকট থেকে সঠিক জবাব পেয়ে তিনি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি রাসূলকে সাবধান করে দিলেন এই মর্মে যে, إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ إِنْ عَلِمُوْا بِإِسْـــلاَمِىْ قَبْـــلَ أَنْ تَـــسْأَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ، 'ইহুদীরা হ'ল মিথ্যা অপবাদ দানকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি জেনে ফেলে, তাহ'লে তারা আপনার নিকটে আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিবে'। তখন তিনি আব্দুল্লাহকে পাশেই আত্মগোপন করতে বলে ইহুদীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদের নিকটে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা বলল, سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَـــا– 'আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র নেতা। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْـــلَمَ عَبْـــدُ اللهِ، আচ্ছা যদি আব্দুল্লাহ মুসলমান হয়ে যায়? তারা দুবার বা তিনবার বলল, أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِـــكَ 'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন'! অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন সালাম গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এটা শোনামাত্র ইহুদীরা বলে উঠলো, شَرُّنَا وَابْـــنُ شَـــرِّنَا 'আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির পুত্র'।[৪] আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন, يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدَ اتَّقُوا اللهَ فَوَ اللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَـــقٍّ– 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই তোমরা ভালভাবেই জানো যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি অবশ্যই সত্য সহ আগমন করেছেন'। জবাবে তারা বলল, كَذَبْتَ 'তুমি মিথ্যা বলছ'।[৫] বলা বাহুল্য এটাই ছিল ইহুদীদের সম্পর্কে রাসূলের প্রথম অভিজ্ঞতা, যা তিনি মদীনায় অবতরণের প্রথম দিকেই হাছিল করেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন :

পূর্বোক্ত সামগ্রিক অবস্থা সম্মুখে রেখে এক্ষণে আমরা মদীনায় নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং বাইরের অবস্থা সামাল দিয়ে চলতে হয়েছে। নতুন জাতি গঠনের প্রধান ভিত্তি হ'ল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন। সেজন্য তিনি ক্বোবায় প্রথম মসজিদ নির্মাণের পর এবার মদীনায় প্রধান মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ :

মদীনায় প্রবেশ করে রাসূলের উটনী যে স্থানে প্রথম বসে পড়েছিল, সেই স্থানটিই হ'ল মসজিদে নববীর কেন্দ্রস্থল। স্থানটির মালিক ছিল দু'জন ইয়াতীম বালক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দীনার মূল্যে স্থানটি খরীদ করলেন। আবুবকর (রাঃ) মূল্য পরিশোধ করলেন।[৬] অতঃপর তার আশপাশের কবরগুলি এবং বাড়ী-ঘরের ভগ্নস্তূপ সহ স্থানটি সমতল করলেন। গারক্বাদের খেজুর গাছগুলি উঠিয়ে সেগুলিকে ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেওয়া হয়।[৭] ঐ সময় ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ছিল মদীনা হ'তে উত্তর দিকে। তিনটি দরজার দু'বাহুর স্তম্ভগুলি পাথরের, মধ্যের খাম্বাগুলি খেজুর বৃক্ষের, দেওয়াল কাঁচা ইটের, ছাদ খেজুর ডালপাতার এবং বালু ও ছোট কাঁকর বিছানো মেঝে- এই

২. *বুখারী হা/৩৯৪১, 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, ৫২ অনুচ্ছেদ।*
৩. *ফাৎহুল বারী হা/... ৭/২৭৫।*
৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৭০, 'রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা অধ্যায়, 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ।*
৫. *বুখারী হা/৩৯১১ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, ৪৫ অনুচ্ছেদ।*
৬. *কুতুবুদ্দীন, তারীখুল মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ, পৃঃ ৯২।*
৭. *তারীখুল মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ, পৃঃ ৯২-৯৩।*

নিয়ে তৈরী হ'ল মসজিদে নববী, যা তখন ছিল ৭০×৬০×৭ হাত আয়তন বিশিষ্ট। পরবর্তীতে বাড়িয়ে ১০০×১০০×৭ করা হয়। যেখানে বর্ষায় বৃষ্টি ঝরে পড়ত। ১৬ বা ১৭ মাস পরে ক্বিবলা পরিবর্তিত হ'লে উত্তর দেওয়ালের বদলে দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে ক্বিবলা ঘুরে যায়। কেননা মক্কা হ'ল মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে। এ সময় উত্তর দেওয়ালের বাইরে একটা খেজুর পাতার ছাপড়া দেওয়া হয়।[৮] আরবীতে বারান্দা বা চাতালকে 'ছুফফাহ' বলা হয়। উক্ত ছুফফাহ'তে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় মুসলমানদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হ'ত। পরবর্তীতে তাদের কোন ব্যবস্থা হয়ে গেলে তারা চলে যেতেন। বারান্দায় বা চাতালে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণকারীগণ ইতিহাসে 'আছহাবে ছুফফাহ' (أصحاب الصفة) নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। বিখ্যাত হাদীছবেত্তা ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এখানকার অন্যতম সদস্য ছিলেন। যিনি পরবর্তীকালে ওমরের যুগে বাহরায়নের এবং উমাইয়া যুগে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত হন।[৯] মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করেন। এ সময় তিনি সাথীদের উৎসাহিত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে বলতেন,

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَه + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ-

'হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ব্যতীত কোন আরাম নেই'। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْآخِرَهْ + فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

'হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর'। মসজিদ নির্মাণের বরকত মণ্ডিত কাজের প্রতি উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বলেন,

هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ + هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ-

'এটা খায়বারের বোঝা নয়। একাজ আমাদের পালনকর্তার অতীব পুণ্যময় ও পবিত্র কাজ'। রাসূলের নিজ হাতে কাজ করায় উৎসাহিত হয়ে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন-

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ + لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ-

'যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী কাজ করেন, তবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে হবে নিতান্তই ভ্রষ্ট আমল'।[১০]

নবীগৃহ নির্মাণ :

এই সময় মসজিদের পাশে একই নিয়মে কতগুলি ঘর তৈরী করা হয়। এগুলি ছিল নবীপত্নীগণের জন্য আবাসিক কক্ষ। এগুলি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবু আইয়ূবের গৃহ ছেড়ে সপরিবারে এখানে চলে আসেন।

(২) আযানের প্রবর্তন : মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর মুছল্লীদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আহ্বানের জন্য পরামর্শ সভা বসে। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। পরে একই রাতে ১১ জন ছাহাবী বর্তমান আযানের স্বপ্ন দেখেন। পরদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদে রব্বিহী (রাঃ) প্রথমে এসে রাসূলকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালে তিনি উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের ধ্বনি শুনে কাপড় ঘেঁষতে ঘেঁষতে ওমর (রাঃ) দৌড়ে এসে বললেন 'হে রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফালিল্লা-হিল হামদ'।[১১] বলা বাহুল্য, এই আযান কেবল ধ্বনি মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল শিরকের অমানিশা ভেদকারী আপোষহীন তাওহীদের এক দ্ব্যর্থহীন আহ্বান। যা কেবল সে যুগে মদীনার মুশরিক ও ইহুদী-নাছারাদের হৃদয়কে ভীত-কম্পিত করেনি বরং যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শিরকী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা। এ আযান যুগে যুগে প্রত্যেক আল্লাহ প্রেমিকের হৃদয়ে এনে দেয় এক অনন্য প্রেমের মূর্ছনা। যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাগলপরা হয়ে ছুটে চলে মুমিন মসজিদের পানে। লুটিয়ে পড়ে সিজদায় স্বীয় প্রভুর সকাশে। তনুমন ঢেলে দিয়ে নিবেদন করে আল্লাহ্র দরবারে। বাংলার কবি কত সুন্দরই না গেয়েছেন-

কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী
কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি' (কায়কোবাদ)।

ইহুদীদের বাঁশি, নাছারাদের ঘণ্টাধ্বনি ও পৌত্তলিকদের বাদ্য-বাজনার বিপরীতে মুসলমানদের আযান ধ্বনির মধ্যেকার পার্থক্য আসমান ও যমীনের পার্থক্যের ন্যায়। আযানের মধ্যে রয়েছে ধ্বনির সাথে বাণী, রয়েছে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, রয়েছে আপোষহীন আক্বীদার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

৮. *তারীখুল মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ, পৃঃ ৯৩।*
৯. *তাহযীবুত তাহযীব ১২/২৪০ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৩৯।*
১০. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৮৪।*
১১. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৬৯; ঐ, আওন সহ হা/৪৯৫।*

এবং রয়েছে আত্মনিবেদন ও আত্মকল্যাণের এক হৃদয়ভেদী আহ্বান। এমন বহুবিধ অর্থবহ মর্মস্পর্শী ও সুউচ্চ আহ্বানধ্বনি পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন জাতির মধ্যে নেই। ১ম হিজরী সনে আযান চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তা প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে দিকে অবিরামভাবে অপ্রতিহত গতিতে। কারণ আহ্নিক গতিতে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রতি স্থানে সর্বদা ছালাতের সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে আযানের সময়ের। ঢাকায় যখন যোহরের ওয়াক্ত হচ্ছে, তার এক মিনিট আগে হচ্ছে পূর্বদিকের যেলায় আবার এক মিনিট পরে হচ্ছে পশ্চিম দিকের যেলায়। এভাবে পৃথিবীর সর্বত্র দিবসে ও রাত্রে প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটে আযান হচ্ছে। আর সেই সাথে ধ্বনিত হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যবাণী এবং উচ্চকিত হচ্ছে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও বড়ত্বের অনন্য ধ্বনি। মানুষ যদি কখনো এ আহ্বানের মর্ম বুঝে এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাবে শিরকী জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকার। দূর হবে মানুষের প্রতি মানুষের দাসত্ব। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। শৃংখলমুক্ত হবে সত্য, ন্যায় ও মানবাধিকার।

(৩) আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন :

মসজিদে নববীর নির্মাণ কার্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়, তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস বিন মালেকের গৃহে আনছার ও মুহাজির উভয় দলের নেতৃস্থানীয় ৯০ জন ব্যক্তির এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক আহ্বান করেন, যেখানে উভয় দলের অর্ধেক অর্ধেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের (المؤاخاة الإسلامية) বন্ধন স্থাপন করেন এই শর্তে যে, 'তারা পরস্পরের দুঃখ-বেদনার সাথী হবেন এবং মৃত্যুর পরে পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন'। তবে উত্তরাধিকার লাভের শর্তটি ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। যেখানে বলা হয়, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ– 'বংশ সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের অধিক হকদার আল্লাহ্র কিতাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞাত' *(আনফাল ৮/৭৫)*। তবে উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি রহিত হ'লেও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অটুট এবং অনন্য। বিশ্ব ইতিহাসে এইরূপ নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কোন তুলনা নেই। দু'একটি দৃষ্টন্ত প্রদত্ত হ'ল-

ভ্রাতৃত্বের নমুনা :

(১) **আব্দুর রহমান বিন 'আওফ :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাজির আব্দুর রহমান বিন আওফকে আনছার সা'দ বিন রাবী'-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। অতঃপর সা'দ তার মুহাজির ভাইকে বললেন, 'আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পসন্দ করেন বলুন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন'। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দো'আ করলেন, بارك الله فى اهلك ومالك، 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন'! আপনি আমাকে আপনাদের বাজার দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে বনু ক্বায়নুক্বা-র বাজার দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি সেখানে গিয়ে পনীর ও ঘি-এর ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে সচ্ছলতা লাভ করলেন। এক সময় তিনি বিয়ে-শাদীও করলেন।[১২]

(২) **খেজুর বাগান ভাগ করে দেবার প্রস্তাব :** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আনছারগণ একদিন রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করল যে, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলি আমাদের ও মুহাজির ভাইগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন তারা বলল যে, তবে এমন করুন যে, মুহাজির ভাইগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং আমরা ফলের অংশ দিব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে সম্মত হ'লেন।[১৩]

(৩) **জমি বণ্টনের প্রস্তাব :** বাহরায়েন এলাকা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানকার পতিত জমিগুলি আনছারদের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে চাইলে তারা আপত্তি করে বলল, আমাদের মুহাজির ভাইদের উক্ত পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেওয়ার পরে আমাদের দিবেন। তার পূর্বে নয়।[১৪]

নবতর জাতীয়তা :

এতে বুঝা যায় যে, মুহাজির ভাইদের জন্য আনছারগণের সহমর্মিতা কত গভীর ছিল। মূলতঃ এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার মাধ্যমে বংশ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতি আরবের চিরাচরিত বন্ধন সমূহের উপরে তাওহীদ ও আখেরাত ভিত্তিক নবতর এক অটুট জাতীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে

১২. *বুখারী, হা/৩৭৮০-৮১ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, ৩৩ অনুচ্ছেদ ও হা/২৬৩০ 'হেবা' অধ্যায়, ৩৫ অনুচ্ছেদ।*
১৩. *ঐ, হা/৩৭৮২।*
১৪. *বুখারী হা/২৩৭৬ 'জমি সেচ করা' অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ।*

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তি।

উপ্ত হয় এক অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ইসলামী সমাজের বীজ। 'আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান'- এই মহান সাম্যের বাণী ও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখে আজীবন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মযলূম জনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে নিগৃহীত ও শোষিত মানবতা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তমরূপে বিকশিত মানবতা মদীনার আদি বাসিন্দাদের চমকিত করল। যা তাদের স্বার্থান্ধ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নোংরা দুনিয়া পূজা হ'তে মুখ ফিরিয়ে আখেরাত মুখী মানুষের বিজয় মিছিল এগিয়ে চলল। কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাছারা ও মুনাফিকদের যাবতীয় চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফত। যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে দমিত করে অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

বস্তুতঃ আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যদি এইরূপ নিখাদ ঐক্য সৃষ্টি না হ'ত এবং স্থানীয় ও বহিরাগত দ্বন্দ্বের ফাটল দেখা দিত, তাহ'লে মদীনায় মুসলমানদের উঠতি শক্তি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। পরিণামে তাদেরকে চিরকাল ইহুদীদের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ'তে হ'ত। যেভাবে ইতিপূর্বে মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

মদীনার সনদ :

মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বাস্তবে একাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কেননা তারা প্রত্যেকে ছিল ধর্মান্ধতা, স্বার্থান্ধতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা ও একটি সুশৃংখল সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। তবুও বিশাল অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অসাধ্য সাধনে মনোনিবেশ করলেন। এ সময় মদীনায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্পদশালী এবং নেতৃত্ব দানকারী সম্প্রদায় ছিল ইহুদী সম্প্রদায়। তারা মুসলমানদের নবতর জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও তাদের সমাজ নেতাদের অধিকাংশ ছিল রাসূলের প্রতি ঈর্ষান্বিত। কিন্তু অতি ধূর্ত হওয়ার কারণে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

বলা বাহুল্য এই চুক্তিটি ছিল একটি আন্তধর্মীয় ও আন্তসাম্প্রদায়িক চুক্তি, যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে ও একক লক্ষ্যে একটি উম্মাহ বা জাতি গঠিত হয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই চুক্তিনামার ধারা সমূহ লক্ষ্য করলে তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গভীর দূরদৃষ্টি ফুটে ওঠে। উল্লেখ্য যে, চুক্তির বিষয়বস্তুগুলিকে জীবনীকারগণ পৃথক পৃথক ধারায় বিন্যস্ত করেছেন। যা কারু কারু গণনায় ৪৭টি ধারায় বিধৃত হয়েছে। বলা বলে যে, এই সনদ ছিল রাষ্ট্র গঠন ও তার সংবিধান রচনায় পথিকৃৎ এবং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সর্বপ্রথম ভিত্তি স্বরূপ। নিম্নে আমরা উক্ত সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ উল্লেখ করলাম।-

মদীনার সনদের মধ্যে কিছু অংশ ছিল মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে, যাতে ১৫টি ধারা ছিল। কিছু ছিল ইহুদীদের সাথে, যাতে ১২টি ধারা ছিল। এতদ্ব্যতীত মদীনার আশপাশের ছোট ছোট গোত্রগুলির সাথে পৃথক পৃথক চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। যাতে মক্কার কুরায়েশরা এসে তাদের সঙ্গে আঁতাত করতে না পারে। সব চুক্তিগুলোর ধারা একত্রিত করলে ৪৭টি ধারা হয় বলে বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করেছেন। আমরা এখানে চুক্তিনামার প্রধান কয়েকটি ধারা উল্লেখ করলাম।-

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ-

১. 'এটি লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে মুমিন ও মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরায়শী ও ইয়াছরেবী এবং তাদের অনুগামী, যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে'।

২. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ 'এরা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে গণ্য হবে'।

৩. وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِيْ عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنِ دِيْنُهُمْ، مَوَالِيْهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، كَذَلِكَ لِغَيْرِ بَنِيْ عَوْفٍ مِنَ الْيَهُوْدِ- 'বনু আওফের ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে একই জাতিরূপে গণ্য হবে। ইহুদীদের জন্য তাদের দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দ্বীন। এটা তাদের দাস-দাসী ও সংশ্লিষ্টদের জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্য

সমভাবে গণ্য হবে। বনু আওফ ব্যতীত অন্য ইহুদীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে'।

৪. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ، 'এই চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে সকলে মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে'।

৫. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ 'চুক্তিভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে কাজ করবে, পাপাচারের ভিত্তিতে নয়'।

৬. وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارَبِيْنَ 'যুদ্ধ চলাকালে ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে ব্যয়ভার বহন করবে'।

৭. وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَأَنْفُسِهِمْ 'ইহুদীদের মিত্রগণ হুদীদের মতই গণ্য হবে'।

৮. وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيْفِهِ 'মিত্রের অন্যায়ের কারণে ব্যক্তি দায়ী হবে না'।

৯. وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ 'চুক্তিভুক্ত সকলের জন্য মদীনার অভ্যন্তরভাগ হারাম অর্থাৎ নিরাপদ এলাকা হিসাবে গণ্য হবে'।

১০. وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ 'মযলূমকে সাহায্য করা হবে'।

১১. وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلاَ آثِمٌ 'প্রতিবেশীগণ চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ন্যায় গণ্য হবে। তাদের প্রতি কোনরূপ ক্ষতি ও অন্যায় করা হবে না'।

১২. وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যে কোন সমস্যা ও ঝগড়ার সৃষ্টি হ'লে এবং তাতে বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে নীত হবে'।

১৩. وَإِنَّهُ لاَ تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلاَ مَنْ نَصَرَهَا 'কুরায়েশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেওয়া চলবে না'।

১৪. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، 'ইয়াছরিবের উপরে কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।

১৫. وَإِنَّهُ لاَ يَحُوْلُ هَذَا الْكِتَابُ دُوْنَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ 'কোন অত্যাচারী ও পাপীর জন্য এ চুক্তিনামা কোনরূপ সহায়ক হবে না' *(সূত্রঃ সীরাতে ইবনে হিশাম)*।

হিজরতের প্রথম বছরেই মদীনাবাসী এবং শক্তিশালী ইহুদীদের সাথে অত্র চুক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী খেলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মদীনা তার রাজধানীতে পরিণত হয়। শান্তির এলাকা সম্প্রসারণের জন্য নবী করীম (ছাঃ) পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের এলাকা সমূহে গমন করেন ও তাদেরকে এ চুক্তিতে শামিল করেন। যেমন-

(১) ২য় হিজরীর ছফর মাসে মদীনা হ'তে ২৯ মাইল দূরবর্তী ওয়াদ্দান (ودَّان) এলাকায় এক অভিযানে গেলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেখানকার বনু যামরাহ গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে মানছূরপুরী উক্ত গোত্রের নাম বনু হামযা বিন বকর বিন আবদে মানাফ লিখেছেন।

(২) ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বুওয়াত্ব পাহাড় (جبل بواط) এলাকায় এক অভিযানে গিয়ে তাদেরকেও চুক্তিনামায় শরীক করেন।

(৩) একই বছরের জুমাদাল আখেরাহ মাসে ইয়াম্বু ও মদীনার মধ্যবর্তী যুল উশায়রা (ذو العشيرة) এলাকায় গিয়ে বনু মুদলিজ (بنو مدلج) গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে তিনি চেয়েছিলেন, যেন সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধাশংকা দূরীভূত হয়। তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দাওয়াত ও নছীহতের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে। কিন্তু কাফের ও মুনাফিকদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র হামলা তাঁকে অবশেষে তরবারি ধারণে বাধ্য করে। যে কারণে পরে বদর-ওহোদ প্রভৃতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ২০

(১) সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কর্মীদল সৃষ্টি হ'লেও তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্মীদের পাঠিয়ে বাস্তবতা যাচাই শেষে নেতাকে সবশেষে পদক্ষেপ রাখাই সংস্কারবাদী ও দূরদর্শী নেতার কর্তব্য। হিজরতের জন্য দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষা করার মধ্যে রাসূলের সেই কর্মনীতি আমরা দেখতে পাই।

(২) নেতৃবৃন্দের অকপট আশ্বাস ও সাধারণ জনমত পক্ষে থাকলেও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সর্বদা কিছু শত্রু ও দ্বিমুখী চরিত্রের লোক অবশ্যই থাকবে, সংস্কারবাদী নেতাকে সর্বদা

সে চিন্তা রাখতে হবে এবং সে হিসাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদানী জীবনের প্রথম থেকেই কিছু ইহুদী নেতার বিরুদ্ধাচরণ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দ্বি-মুখী ও কপটাচরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৩) শুধু প্রধান দল নয় বরং অন্যান্য ছোট দল ও সম্প্রদায়কে মূল্যায়ন করা ও তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল একটি বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন করা সম্ভব। হিজরতের পরপরই রাসূলের এ ধরনের দূরদর্শী কর্মনীতি এবং মদীনার সনদ প্রণয়ন ও তাতে সকল দলের স্বাক্ষর গ্রহণ একথার প্রমাণ বহন করে।

(৪) বংশীয়, গোত্রীয় ও ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বৃহত্তর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, রাসূলের মাদানী জীবনের কর্মনীতি তার বাস্তব সাক্ষী।

(৫) একমাত্র ইসলামী বিধানের অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। মদীনার সনদ তার বাস্তব দলীল।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ২১

* নতুন স্থানে গিয়ে নতুন সমাজ গড়তে গেলে সবার আগে প্রয়োজন, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা স্থাপন। প্রথমে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, অতঃপর মুহাজির ও আনছারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের পর ইহুদী সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মদীনার সনদ স্বাক্ষরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত দূরদর্শী পদক্ষেপ প্রতিভাত হয়েছে।

* মানবহিতৈষী ও সমাজদরদী নেতা সাধ্যমত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবেন। সাথে সাথে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত সম্পর্কেও হুঁশিয়ার থাকবেন ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিবেন।

বদর যুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ সমূহ : ২য় হিজরী সনের ১৭ই রামাযান (৬২৪ খৃঃ ১১ই মার্চ শুক্রবার (সুলায়মান মানছূরপুরী বলেন, ৩রা মার্চ মঙ্গলবার) ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যা ছিল মদীনায় হিজরতের মাত্র ১ বছর ৬ মাস ২৭ দিন পরের ঘটনা। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনা থেকে বের করে দেবার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালায়। যেমনভাবে তারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে। এক- সেখানে ছিল একজন ধর্মপরায়ণ খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজত্ব। যিনি নিজে রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দুই- মক্কা ও হাবশার মধ্যখানে ছিল আরব সাগরের একটি প্রশস্ত শাখা। যা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে হামলা করা সম্ভব ছিল না। তিন- হাবশার লোকেরা ছিল হিব্রুভাষী। তাদের সাথে কুরায়েশদের কোনরূপ আত্মীয়তা কিংবা পূর্ব পরিচয় ছিল না। ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলগত মিলও ছিল না।

পক্ষান্তরে ইয়াছরিব ছিল কুরায়েশদের খুবই পরিচিত এলাকা। যার উপর দিয়ে তারা নিয়মিতভাবে সিরিয়াতে ব্যবসার জন্য যাতায়াত করত। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ভাষাগত মিল এবং আত্মীয়তাও ছিল। অধিকন্তু রাস্তা ছিল স্থলপথ, যেখানে নদী-নালার কোন বাধা নেই। দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি হ'লেও সেখানে যাতায়াতে তারা অভ্যস্ত ছিল। এক্ষণে আমরা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরোক্ষ কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

(১) মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের পত্র প্রেরণ। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসূলের আগমনের কারণে তার ইয়াছরিবের নেতৃত্ব লাভের মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সে ছিল দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাসূলের প্রতি তার এই ক্ষোভটাকেই কুরায়েশরা কাজে লাগায় এবং নিম্নোক্ত কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়ে তার নিকটে চিঠি পাঠায়।-

انكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله تقاتله أو لتجرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم-

'তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের করে দিবে অথবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব ও মহিলাদের হালাল করে নেব'।

এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দ্রুত তার সমমনাদের সাথে গোপনে বৈঠকে বসে গেল। কিন্তু সংবাদ রাসূলের নিকটে পৌঁছে গেল। তিনি সরাসরি তাদের বৈঠকে এসে হাযির হ'লেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দেখছি কুরায়েশদের হুমকিকে তোমরা দারুণভাবে গ্রহণ করেছ। অথচ এর মাধ্যমে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, কুরায়েশরা তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। أتريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم 'তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের সাথে (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করতে চাও'? রাসূলের মুখে এ বক্তব্য শুনে

বৈঠক ভেঙ্গে গেল ও দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।[১৫] যদিও আব্দুল্লাহ্র অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকল। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিক ও ইহুদীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে থাকেন। যাতে হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে।

(২) আওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় যান ও কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের অতিথি হন। উমাইয়ার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে নিরিবিলি ত্বাওয়াফ করতে দেখে আবু জাহল তাকে ধমকের সুরে বলে, ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة؟ তোমাকে দেখছি মক্কায় বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করছ। অথচ তোমরা বেদ্বীনগুলোকে আশ্রয় দিয়েছ! ... আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি আবু ছাফওয়ানের (উমাইয়া বিন খালাফের) সাথে না থাকতে, তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না'। একথা শুনে সা'দ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার জন্য এর চেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দাড়াবো- আর সেটা হ'ল মদীনা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের রাস্তা বন্ধ হবে'।[১৬]

(৩) কুরায়েশ নেতারা ইহুদীদের সাথে গোপনে আঁতাত করলো। অতঃপর মুহাজিরগণের নিকটে হুমকি পাঠালো এই মর্মে যে, 'মক্কা থেকে তোমরা নিরাপদে ইয়াছরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড়ো না। ওখানে গিয়েই আমরা তোমাদের ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখি'। তাদের এই হুমকি কেবল ফাঁকা বুলি ছিল না। বরং তারা হর-হামেশা তৎপর ছিল মুহাজিরগণের সর্বনাশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন না। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়ই বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। এক রাতে তিনি বললেন, لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِىْ يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ، 'যদি আমার ছাহাবীগণের মধ্যে যোগ্য কেউ এসে আমাকে রাতে পাহারা দিত'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা এই অবস্থায় (আতংকের মধ্যে) কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব এল, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? সা'দ বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমার অন্তরে ভয় উপস্থিত হ'ল। তাই এসেছি তাঁকে পাহারা দেবার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন ও ঘুমিয়ে গেলেন'।[১৭] এরপর থেকে এরূপ পাহারাদারির ব্যবস্থা নিয়মিত চলতে থাকে। যতক্ষণ না নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، 'আল্লাহ তোমাকে লোকদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন'।[১৮] উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوْا عَنِّى فَقَدْ عَصَمَنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، 'হে লোকেরা! তোমরা ফিরে যাও! মহান আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন'। কুরায়েশদের অপতৎপরতা কেবল রাসূলের বিরুদ্ধেই ছিল না; বরং প্রত্যেক মুহাজির মুসলমানের বিরুদ্ধে ছিল। যেজন্য তারা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন এবং রাতের বেলা অস্ত্র নিয়ে ঘুমাতেন। যেমনটি হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে।

এ সময় ভীত-শংকিত ছাহাবীগণ রাসূলকে বলতে থাকেন, হে রাসূল! আমরা কি চিরকাল এভাবে ভয় ও ত্রাসের মধ্যে কাটাবো? জবাবে আয়াত নাযিল হয়- أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ– 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপরে এখনো সেইসব লোকদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছেন। যাদের উপরে এসেছিল নানাবিধ কষ্ট ও বিপদাপদ। আর সেই ভূমিকম্প সদৃশ বিপদে গ্রেফতার হয়ে তৎকালীন রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ বলে উঠেছিলেন, مَتَى نَصْرُ اللهِ 'কখন আল্লাহ্র সাহায্য পাব'। (তখনই সান্ত্বনা দিয়ে নাযিল হয়েছিল) أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ، শোনো! আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*। হাঁ আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী হ'ল। তবে তা অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নয় বরং মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। তাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হ'ল, যার পিছনে আল্লাহ্র সাহায্য ক্রিয়াশীল ছিল।

যুদ্ধের অনুমতি :

কুরায়েশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা ও প্রকাশ্যে হামলা সমূহ মুকাবিলার জন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى

১৫. *আবুদাঊদ, হা/৩০০৪, 'খারাজ' অধ্যায়।*
১৬. *বুখারী, হা/৩৯৫০ 'মাগাযী' অধ্যায়, ২ পরিচ্ছেদ।*
১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০৫।*
১৮. *মায়েদাহ ৫/৬৭; তিরমিযী হা/৩৩২০ 'তাফসীর' অধ্যায়।*

نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ– 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল ঐ লোকদের। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, একারণে যে, তারা অত্যাচারিত হয়েছে। আর তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমতাবান' *(হজ্জ ২২/৩৯)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নাযিল হয়।[১৯] আর জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ থেকে যুলুম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ– 'যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে খৃষ্টানদের নিরিবিলি গীর্জাসমূহ, তাদের সাধারণ উপাসনালয় সমূহ, ইহুদীদের উপাসনালয় সমূহ এবং মুসলমানদের মসজিদ সমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিধর ও পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

অন্যত্র আল্লাহ জালূত ও তালূত প্রসঙ্গে বলেন, وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ– 'যদি আল্লাহ একজনকে আরেকজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু ও করুণাময়' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

বস্তুতঃ জিহাদ হয়ে থাকে সন্ত্রাস দমনের জন্য। আর সন্ত্রাস হয় সমাজ ধ্বংসের জন্য। এই যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি :

(১) মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম।

(২) মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও বাসগৃহ হ'তে বিতাড়িত তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। স্রেফ বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় *(হজ্জ ৪০)*।

(৩) মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূলের সন্ধিচুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে পূর্বের ধারণা ও রীতি-নীতি পরিবর্তন করে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা হয়, তাহ'লে চুক্তি ও সন্ধি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূলকে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল। ফলে অসহায় মুসলমানদের বাধ্যগত অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। মুবারকপুরী বলেন, সঠিক কথা এই যে, জিহাদের এই অনুমতি হিজরতের পরে মদীনাতেই নাযিল হয়েছিল। এরপর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হয়ে থাকে। যা একবছর অব্যাহত থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর শা'বানে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে জিহাদ ফরয হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারার ২/১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের পূর্বেকার অভিযান সমূহ :

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পরে কুরায়েশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনাভিমুখী রাস্তাগুলিতে নিয়মিত টহল অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তাঁর কৃত সন্ধি চুক্তি সমূহ খুবই ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়। যার এলাকা সমূহ মদীনা হ'তে মক্কার দিকে তিন মনযিল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব অভিযানের যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, সেগুলিকে 'গাযওয়াহ' (غزوة) এবং যেগুলিতে নিজে যেতেন না, বরং অন্যদের পাঠাতেন, সেগুলিকে সারিইয়াহ (سريه) বলা হয়। এইসব অভিযানে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বের হ'লেও বলতে গেলে কোনটাতেই যুদ্ধ হয়নি। তবে মক্কায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়েশদের হুমকিতে মুহাজিরগণ ভীত নন, বরং তারা সদা প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, সকল অভিযানেই পতাকা থাকতো সাদা রংয়ের এবং পতাকাবাহী সেনাপতি থাকতেন পৃথক ব্যক্তি। এক্ষণে এই সময়ের মধ্যে প্রেরিত অভিযান সমূহ বিবৃত হ'ল, যা নিম্নরূপ-

(১) সারিইয়াতু সীফিল বাহ্র (سرية سيف البحر) বা সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত বাহিনী : ১ম হিজরী সনের রামাযান মাসে (মার্চ ৬২৩ খৃঃ) হযরত হামযাহ্-র নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় সিরিয়া হ'তে আবু জাহলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী তিনশত সদস্যের কুরায়েশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হ'লেও জুহায়শ গোত্রের নেতা

১৯. *নাসাঈ, হা/৩০৮৫ 'জিহাদ' অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ।*

মাজদী ইবনু আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর চেষ্টায় যুদ্ধ হ'তে পারেনি।

(২) **সারিইয়াতু রাবেগ (سـرية رابـغ) :** ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ ইবনু মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। এই অভিযানে রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ লোকের বাহিনীর মুখোমুখি হ'লে উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে মাক্কী বাহিনী থেকে দু'জন দল ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে চলে আসেন। যারা গোপনে মুসলমান ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন মিক্বদাদ বিন আমর এবং অন্যজন হ'লেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান।

(৩) **সারিইয়াহ খাররার (سـرية الخـرّار) :** ১ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্ক্বাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় কুরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারা জুহফার নিকটবর্তী খাররার উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। কেননা মক্কার কাফেলা এখান থেকে একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। মানছূরপুরী ঐ স্থানের নাম যাররার (ضـرار) বলেছেন।

(৪) **গাযওয়া ওয়াদ্দান (غزوة ودَّان) :** ২য় হিজরীর ছফর মাসে মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন, যাতে ৭০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনা থেকে ২৯ মাইল দূরবর্তী এই অভিযানে তিনি ১৫ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন এবং যাওয়ার সময় খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহকে মদীনায় প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে যান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলার পথরোধ করা। কিন্তু বাস্তবে তাদের দেখা মেলেনি। তবে এই সফরে লাভ হয় এই যে, তিনি স্থানীয় বনু যামরাহ গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন। এই চুক্তি সম্পর্কে মানুছূরপুরী বলেন, সে চুক্তিটি এ মর্মে হয় যে, তারা মুসলমান ও কুরায়েশ কোন পক্ষকে সাহায্য করবে না।[২০] কিন্তু মুবারকপুরী চুক্তিনামাটি উদ্ধৃত করেছেন এই মর্মে যে, উভয় পক্ষ পরস্পরকে সাহায্য করবে।[২১]

(৫) **গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব (غـزوة بـواط) :** ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মুতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দু'শো ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ অভিযানে বের হন। উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে একশ' জনের কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি আওস নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যান।

(৬) **গাযওয়ায়ে সাফওয়ান (غزوة سفوان) :** একই মাসে মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের ফিহরী মদীনার চারণ ভূমি থেকে গবাদি-পশু লুট করে পালিয়ে গেলে ৭০ জন ছাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু লুটেরাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এই অভিযানকে অনেকে গাযওয়ায়ে বদরে ঊলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মদীনার আমীর ছিলেন যায়েদ ইবনু হারেছাহ (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল মদীনার উপকণ্ঠে কুরায়েশদের প্রথম হামলা।

(৭) **গাযওয়ায়ে যুল-'উশাইরাহ (غزوة ذى العشيرة) :** ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মুতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দেড়শ বা দু'শো ছাহাবীর একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মূল্যবান রসদবাহী কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধে বের হন। কিন্তু ইয়াম্বু'-এর পার্শ্ববর্তী উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও তাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন আবু সালামাহ (রাঃ)। এই কুরায়েশ কাফেলাটি বহাল তবিয়তে মক্কায় ফিরে যায় এবং এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনু যামরাহ্র সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করেন।

(৮) **সারিইয়াহ নাখলা (سرية نخلـة) :** ২য় হিজরীর রজব মাসে মোতাবেক ৬২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে মাত্র ১২ জন ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। তারা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে একটি কুরায়েশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করে দু'জন বন্দী সহ গনীমতের মালামাল নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্ত মূল্য দেন। কেননা ঘটনাটি ঘটেছিল রজবের হারাম মাসের শেষ দিনে। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লংঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ নং আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয় যে, মুসলমানদের এই কাজের তুলনায় মুশরিকদের অপকর্ম সমূহ বহু গুণ বেশী অপরাধজনক। উল্লেখ্য যে, এর পরেই জিহাদ ফরয করে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়। অতঃপর রামাযানে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

---

২০. রাহমাতুল লিল আলামীন ২/১৮৬।
২১. আর-রাহীক্ব ১৯৮।

শেষোক্ত অভিযানে কুরায়েশদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তাদের আশংকাই সত্যে পরিণত হ'তে যাচ্ছে এবং মদীনা তাদের জন্য এখন বিপদ সংকুল এলাকায় পরিণত হয়েছে। তারা এটাও বুঝে নিল যে, যেকোন সময় মুহাজিরগণ মক্কা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হটকারিতা ও উদ্ধত আচরণ থেকে তারা বিরত হ'ল না। তারা সন্ধির পথে না গিয়ে যুদ্ধের পথ বেছে নিল এবং মদীনায় হামলা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে বদর যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ক্বিবলা পরিবর্তন :

নাখ্‌লা অভিযান শেষ হবার পরেই ২য় হিজরীর শা'বান মুতাবিক ৬২৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ সূচক আয়াতটি *(বাক্বারাহ ১৪৪)* নাযিল হয়। যাতে ১৬/১৭ মাস পরে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হ'তে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ জারি করা হয়। এই হুকুম নাযিলের মাধ্যমে কপট ইহুদীদের মুখোশ খুলে গেল। যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়েছিল স্রেফ ফাটল ধরানো ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য। এখন তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেল এবং মুসলমানেরাও তাদের কপটতা ও খেয়ানত থেকে বেঁচে গেল। অন্যদিকে এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল যে, এখন থেকে একটি নতুন যুগের সূচনা হ'তে যাচ্ছে, যা ফেলে আসা ক্বিবলা কা'বা গৃহের উপরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একই সময়ে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় وَأَخْرِجُوْهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ 'যে স্থান হ'তে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, সে স্থান হ'তে তোমরাও তাদের বহিষ্কার কর'। অতঃপর যুদ্ধের নিয়মবিধি নাযিল হয় সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ আয়াতে। অতঃপর যুদ্ধ হ'তে ভীরু-কাপুরুষদের নিন্দা করে একই সূরার ২০ নং আয়াত নাযিল হয়। একই সময়ে পরপর এসব আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, হক ও বাতিলের মধ্যে একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়ার সময়কাল অত্যাসন্ন। কেননা আল্লাহ কখনোই চান না যে, তাঁর পবিত্র গৃহ নাপাক মুশরিক ও পৌত্তলিকদের দখলীভুক্ত হয়ে থাকুক। বলা বাহুল্য ক্বিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিলের পরে রাসূলের মধ্যে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মধ্যে আশা ও আনন্দের ঢেউ জেগে ওঠে এবং তাদের অন্তরে মক্কায় ফিরে যাওয়ার আকাংখা ও উদ্দীপনা তীব্র হয়ে ওঠে, যা আসন্ন বদর যুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী হ'তে সাহায্য করে।

বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিরিয়া ফেরত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাদের পুরা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সাঈদ বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। তারা 'হাওরা' (الحوراء) নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা সত্বর ঐ স্থান অতিক্রম করবে; যাতে রয়েছে এক হাযার উট বোঝাই কমপক্ষে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার মাল-সম্পদ এবং তাদের প্রহরায় রয়েছে আমর ইবনুল আছ সহ মাত্র ৪০ জন সশস্ত্র জোয়ান। উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যে মক্কার সকল নারী-পুরুষ অংশীদার ছিল। তারা দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে রাসূলকে এই খবর দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা করলেন যে, এই বিপুল মাল-সম্পদ মক্কায় পৌঁছে গেলে তার প্রায় সবই ব্যবহার করা হবে মদীনায় মুহাজিরগণকে ধ্বংস করার কাজে। অতএব আর মোটেই কালক্ষেপন না করে তখনই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই কাফেলাকে আটকানোর জন্য।

বদর যুদ্ধের বিবরণ :

মাদানী বাহিনীর অগ্রযাত্রা : ২য় হিজরীর ১৭ রামাযান ৬২৪ খৃঃ ১১ মার্চ শুক্রবার *(মানছূরপুরী ৩ মার্চ মঙ্গলবার বলেছেন)*। বিগত অভিযানগুলির ন্যায় এ অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলাকে আটকানো। তাই অন্যান্য অভিযানের মতই এটাকে ভাবা হয়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে অভিযানে যেতে বাধ্য করেননি। অবশেষে ৮ অথবা ১২ই রামাযান তারিখে ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের কাফেলা নিয়ে সাধারণ প্রস্তুতি সহ তিনি রওয়ানা হ'লেন। যার মধ্যে ৮২, ৮৩ বা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকীগণ ছিলেন আনছার। আনছারগণের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজের। বি'রে সুক্বইয়া নামক স্থানে এসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস ইবনু আবী ছা'ছা'কে সংখ্যা গণনা করতে বললেন। পরে সংখ্যা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। এটা বিজয়ের লক্ষণ। তিন শতাধিক লোকের এই বাহিনীতে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদের এবং ৭০টি উট ছিল। যাতে দু'তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ'ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও মারছাদ বিন আবী মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এ সময় মদীনায় আমীর নিযুক্ত হন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। পরে 'রাওহা' بئر الروحاء নামক স্থানে পৌঁছে আবু লুবাবা ইবনু আবদিল মুনযিরকে 'আমীর' নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। অপর পক্ষে

কাফেলার পতাকা বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয় মদীনার প্রথম দাঈ মুছ'আব বিন ওমায়েরকে। ইতিপূর্বেকার সকল পতাকার ন্যায় আজকের এ পতাকাও ছিল শ্বেত বর্ণের। ডান বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত হন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম এবং বাম বাহুর জন্য মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)। পুরা বাহিনীতে এ দু'জনেরই মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। আর পশ্চাদ্ভাগের সেনাপতি নিযুক্ত হন ক্বায়েস ইবনু আবী ছা'ছা'আহ (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত মুহাজিরগণের পতাকা বাহক হন আলী (রাঃ) এবং আনছারগণের সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)। আর সার্বিক কম্যাণ্ডের দায়িত্বে থাকেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।

কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলার অবস্থা :

অন্যদিকে কুরায়েশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিলেন। যাকেই পেতেন, তাকেই মদীনা বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি একটি সূত্রে জানতে পারলেন যে, কাফেলার উপরে হামলা করার জন্য মুহাম্মাদ নির্দেশ দিয়েছেন। এ সংবাদে ভীত হয়ে আবু সুফিয়ান একজনকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন, যাতে দ্রুত সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে যায়। এরপর বদর প্রান্তর অতিক্রম করার আগেই তিনি কাফেলা থামিয়ে দিয়ে নিজে অগ্রসর হন ও মদীনা বাহিনীর খবর নেন এবং জানতে পারেন যে, দু'জন উষ্ট্রারোহীকে তারা দেখেছিল, যারা টিলার পাশে তাদের উট বসিয়ে মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে গেছে। সুচতুর আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে টিলার পাশে গিয়ে উটের গোবর থেকে খেজুরের আঁটি খুঁজে পেয়ে বুঝে নিলেন যে, এটি মদীনার উট। ব্যস! তখনই ফিরে এসে কাফেলাকে নিয়ে বদরের পথ ছেড়ে ডান দিক দিয়ে উপকূলের পথে চলে গেলেন এবং এভাবে তিনি স্বীয় কাফেলাকে মদীনা বাহিনীর কবল থেকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হ'লেন। অতঃপর তিনি নিরাপদে পার হয়ে আসার খবর মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। যাতে ইতিপূর্বে পাঠানো খবরের রেশ ধরে তারা অহেতুক যুদ্ধে বের না হয়।

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৪র্থ কিস্তি)

(২৩) মোজার উপরে ও নীচে মাসাহ করাঃ

অনেককে মোজার উপরে নীচে উভয় দিকে মাসাহ করতে দেখা যায়। অথচ সুন্নাত হ'ল মোজার উপরে মাসাহ করা।[২২] উপরে-নীচে উভয় দিকে মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন-

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا-

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে ওযূ করিয়েছি। তিনি দুই মোজার উপরে এবং নীচে মাসাহ করেছেন।[২৩]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এই হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। আমি ইমাম আবু যুর'আহ ও ইমাম বুখারীকে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আবূদাঊদও একে দুর্বল বলেছেন।[২৪] এই হাদীছের সনদে ছাওর নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, সে রাজা ইবনু হাইওয়া থেকে না শুনেই বর্ণনা করেছে।[২৫]

জ্ঞাতব্য : বর্তমানে অনেকেই মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নীচে লুঙ্গি-প্যান্ট পরিধান করাকে জায়েয বলছেন ও পরিধান করছেন। এটা শরী'আতকে ছোট করার মিথ্যা কৌশল মাত্র। পাশ্চত্য অপসংস্কৃতির সাথে আপোস করে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে নস্যাৎ করতে চায়।

(২৪) ওযূর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পড়াঃ

ওযূর দো'আ পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَــرِيْكَ لَــهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ الْجَنَّــةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ-

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করল অতঃপর আকাশের দিকে চোখ তুলে দো'আ পড়ল তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যেকোন দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে।[২৬]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি মুনকার। 'আকাশের দিকে তাকানো' অংশটুকু ছহীহ হাদীছের বিরোধী। তাই শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এই অতিরিক্ত অংশটুকু অস্বীকৃত। কারণ ইবনু আম আবী উক্বাইল এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে অপরিচিত'।[২৭]

(২৫) ওযূর পরে সূরা ক্বদর পড়াঃ

উক্ত আমল সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ আশরাফ আলী থানবী তার বইয়ে সূরা ক্বদর পড়ার কথা বলেছেন এবং ওযূর পরের দো'আর সাথে অনেকগুলো নতুন শব্দ যোগ করেছেন যা হাদীছের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় না।[২৮]

অতএব ওযূর করার পর শুধু নিম্নের দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَــهُ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-[২৯]

(২৬) রক্ত বের হ'লে ওযূ ভেঙ্গে যায়ঃ

২২. ছহীহ বুখারী হা/১৮২; মুসলিম হা/৬৪৯; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৬১ ও ১৬২, ১/২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/৯৮, ১/২৮-২৯ পৃঃ।

২৩. আবূদাঊদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫৫০, পৃঃ ৪২; মিশকাত হা/৫২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬, ২/১৩১ পৃঃ।

২৪. هذا حديث معلول وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح وكذا ضعفه أبوداود- যঈফ তিরমিযী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ)।

২৫. যঈফ আবূদাঊদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ।

২৬. আহমাদ হা/১২১; মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৩।

২৭. وهذه الزياوة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا وهو مجهول. -আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬ এর আলোচনা, ১/১৩৫ পৃঃ।

২৮. পূর্ণাঙ্গ নামায, পৃঃ ৪৫।

২৯. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৬, ১/১২২ পৃঃ; মিশকাত ৩৯ পৃঃ, হা/২৮৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫, ১/১৮ পৃঃ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৯; ইরওয়া হা/৯৬, সনদ ছহীহ।

শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত বের হ'লে ওযূ করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ-

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণেই ওযূ করতে হবে।[৩০]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ।[৩১] ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তামীম দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু খালেদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ দুইজনই অপরিচিত।[৩২]

তাছাড়া রক্ত বের হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম ওযূ করতেন না মর্মে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ بْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِيْ وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَحَكَّهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ-

বাকর (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডলে উঠা ফোড়ায় চাপ দিলেন ফলে কিছু রক্ত বের হ'ল। তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ঘষে দিলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করেন কিন্তু ওযূ করেননি।[৩৩]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রক্ত বের হ'লে ওযূ করা ওয়াজিব হবে মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তা কম হোক বা বেশী হোক।[৩৪]

(২৭) বমি হ'লে ওযূ ভেঙ্গে যায়ঃ

ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে বমিকে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। আর মানুষও তাই আমল করে থাকে। অথচ তার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয় তাহ'লে সে যেন ফিরে যায় এবং ওযূ করে। এরপর পূর্ববর্তী ছালাতের উপর ভিত্তি করে ছালাত আদায় করে। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।[৩৫]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে, সে যঈফ। সে হিজাযের দুই ব্যক্তি বর্ণনা করেছে কিন্তু তাও যঈফ।[৩৬]

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَلْسُ حَدَثٌ.

যায়েদ ইবনু আলী তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বমি অপবিত্র।[৩৭]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি নিতান্ত যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, এর সনদে সাওর নামক রাবী রয়েছে সে যায়েদ বা অন্য কারো নিকট থেকে বর্ণনা করেনি।[৩৮]

অতএব বমি হ'লে ওযূ করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ বিধান নেই।

জ্ঞাতব্য : হেদায়া ও কুদূরীতে রক্ত বের হওয়া ও বমি হওয়াকে ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯] আর সে কারণেই এই আমল চালু আছে। দুঃখজনক হ'ল,

৩০. দারাকুৎনী ১/১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০; মিশকাত হা/৩৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৭, ২/৫৭।

৩১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০।

৩২. দারাকুৎনী ১/১৫৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৩৩ - عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان

৩৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/৬৮৩ পৃঃ- وهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة ।

৩৪. وَلاَ يَصِحُّ حَدِيْثٌ فِيْ وُجُوْبِ الْوَضُوْءِ مِنَ الدَّمِ كَانَ قَلِيْلاً أَوْ كَثِيْرًا-আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রঃ ১/১০৮ পৃঃ।

৩৫. ইবনু মাজাহ হা/১২২১, 'ছালাত কায়েম ও তার সুন্নাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৭।

৩৬. في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة -যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২২১; যঈফ আবূদাঊদ (আল-উম্ম), পৃঃ ৬৮; যঈফুল জামে' হা/৫৪২৬।

৩৭. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ।

৩৮. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৭৫, ৯/৭২ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৪১৩৯।

৩৯. والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقئ ملء الفم. -হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩; বঙ্গানুবাদ ১/৮-৯ পৃঃ; কুদূরী, পৃঃ ৫।

ইমাম দারাকুৎনীর উক্ত মন্তব্য থাকতে হেদায়া ও কুদূরীতে কিভাবে তা পেশ করা হ'ল?

(২৮) ওযূ থাকা সত্ত্বেও ওযূ করলে দশগুণ নেকী:

উক্ত ফযীলত সঠিক নয়। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُودِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُودِىَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَـهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ওযূ অবস্থায় ওযূ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে।[৪০]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী, মুনযেরী, ইরাক্বী, নববী, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে একমত।[৪১] উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বী ও গুত্বাইফ নামক দুই দুর্বল ও অপরিচিত রাবী আছে।[৪২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّـأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার করে ওযূ করবে সে ব্যক্তি ওযূর নিয়ম পালন করল, যা তার জন্য আবশ্যক ছিল। যে ব্যক্তি দুইবার করে ধৌত করবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার করে ধৌত করবে তার ওযূ আমার ও আমার পূর্বের নবীগণের ওযূর ন্যায় হ'ল।[৪৩]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ।[৪৪] উক্ত যঈফ হাদীছ হেদায়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৫]

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা যখন উত্তমরূপে ওযূ করে তখন আল্লাহ তার সামনের ও পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।[৪৬]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত।[৪৭]

(২৯) তায়াম্মুমের সময় দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা:

তায়াম্মুম করার সময় একবার মাটিতে হাত মারতে হবে এবং কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِـى التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারতে হবে। মুখের জন্য একবার আর কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসাহর জন্য একবার।[৪৮]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে কয়েকজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর আল-উমরা নামক রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হিসাবে যঈফ। আলী ইবনু যাবইয়ান নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক, অপবিত্র। ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী এবং ইমাম নাসাঈ বলেন, সে হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী।[৪৯]

---

৪০. আবূদাঊদ হা/৬২, ১/৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫১২, পৃঃ ৩৯; তিরমিযী হা/৫৯, ১/১৯ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩, ২/৪৩ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭।

৪১. যঈফ আবূদাঊদ হা/১০।

৪২. আবূদাঊদ হা/৬২; ইবনু মাজাহ হা/৫১২; তিরমিযী হা/৫৯; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৩, ১/৯৬ পৃঃ।

৪৩. মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭৩৫; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৪।

৪৪. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩৬; তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/৫৭৩৫।

৪৫. ঐ, ১/১৯ পৃঃ)। এর সনদে যায়েদ আল-আম্মী নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। =(যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৪২০।

৪৬. মুসনাদুল বাযযার হা/৪২২, ১/৯৩ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯২।

৪৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৩৬, ১১/৬২ পৃঃ।

৪৮. বায়হাক্বী হা/১০৫৪, ১/২০৭; হাকেম হা/৬৩৪ ও ৬৩৬; আবূদাঊদ হা/৩৩০, ১/৪৭ পৃঃ; দারাকুৎনী ১/১৭৭; বলূগুল মারাম হা/১২৮; বিস্তারিত দ্রঃ তানক্বীহ, পৃঃ ১৯৪-১৯৭।

৪৯. وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن عمر هو العمري المكـبر ضعيف سيىء الحفظ ووقـع في المـستدرك عبيـد الله بـن عمرمصغراً ولعله خطأ مطبعي .وعلي بن ظبيان ضعيف جداً . قال ابن معين كذاب خبيث وقال البخاري منكـر الحـديث وقال النسائي متروك الحـديث. -সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪২৭; যঈফুল জামে' হা/২৫১৯; যঈফ আবূদাঊদ হা/৩৩০।

প্রশ্ন হ'ল, উক্ত হাদীছ হেদায়া ও কুদূরীতে কিভাবে স্থান পেল?[৫০] অথচ ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সম্পর্কে।[৫১] সেই হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার কারণ অজানা।

عن نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ-

নাফে' বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর এক কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তার কাজ সমাধা করলেন। সেই দিন তার কথার মধ্যে এই কথা ছিল যে, কোন এক ব্যক্তি এক গলিতে চলছিল এমন সময় রাসূল (ছা)-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা পেসাবখানা থেকে বের হয়েছেন। সে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর নিলেন না। এমনকি যখন গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দুই হাত দেওয়ালের উপর মারলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং দুই হাত মাসাহ করলেন। তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন আর বললেন, আমি ওযূ অবস্থায় ছিলাম না। উহাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল।[৫২]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন ছাবিত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে'।[৫৩] ইমাম বুখারী এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনও অনুরূপ বলেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীটি ছহীহ নয়। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত আল-আবদী অত্যন্ত দুর্বল। তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না[৫৪] ইমাম আবূদাঊদ আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুইবার হাত মারা ও ইবনু ওমরের কাজের যে বর্ণনা করেছে এই ঘটনার ব্যাপারে সে নির্ভরযোগ্য নয়।[৫৫]

তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতিঃ

পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটিতে দুই হাত একবার মারবে।[৫৬] অতঃপর ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমণ্ডল তারপর দুই হাত একবার কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ-

'তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটির উপর মারলেন এবং ফুঁক দিলেন। অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[৫৭]

উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদে দুইবার হাত মারা ও পুরো হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ বিশুদ্ধ হ'লেও সেগুলো মূলতঃ কতিপয় ছাহাবীর ঘটনা মাত্র। যা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগের বিষয়।[৫৮] অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুমের উক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। যেমন- ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেন,

هذا حكاية فعلهم لم ننقله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما حكى عمار عن نفسه التمعك فى حال الجنابة

---

৫০. হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ; কুদূরী পৃঃ ১২।
৫১. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।
৫২. আবূদাঊদ হা/৩৩০, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭, ২/১০৯ পৃঃ, 'অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মিলামেশা' অনুচ্ছেদ।
৫৩. قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ -যঈফ আবূদাঊদ হা/৩৩০।
৫৪. لا يحتج لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً، بحديثه যঈফ আবূদাঊদ (আল-উম্ম) হা/৫৮, পৃঃ ১৩৬।
৫৫. لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ -যঈফ আবূদাঊদ হা/৩৩০।
৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১; ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪০২।
৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।
৫৮. আবূদাঊদ হা/৩১৮, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৩৬।

فلما سأل النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فعله.

'এটা ছাহাবীদের কাজের ঘটনা, যা আমরা রাসূল (ছাঃ) থেকে নকল করতে পারিনি। যেমনটি আম্মার (রাঃ) জুনুবী অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করার ঘটনা নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি শুধু মুখমণ্ডল ও দুই কব্জি মাসহের নির্দেশ দান করেন। এ পর্যন্তই শেষ করেছেন। আর আম্মার (রাঃ) তার কাজ থেকে ফিরে আসেন।[৫৯]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

لكن العمل ليس عليه لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بتعليم من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما العمل على حديثه الآخر الآتي بعده-

'কিন্তু আমল এর উপর (দুই হাত মারা) ছিল না। কারণ তখন ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী করেননি। বরং আমল ছিল শেষ হাদীছের প্রতি, যা পরেই আসছে।[৬০] অতএব রাসূলের আমল ও বক্তব্যই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়।

(৩০) মুছল্লীর ওযূতে ত্রুটি থাকলে ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হয়:

আলেমদের মাঝে উক্ত বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ-

শাবীব আবী রাওহ ছাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করলেন এবং সূরা রূম পড়লেন। কিন্তু পড়ার মাঝে কিছু গোলমাল হ'ল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে অথচ উত্তমরূপে ওযূ করে না। এরাই আমাদের কুরআন তেলাওয়াতে গোলযোগ ঘটায়।[৬১]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[৬২]

(২৮) মাথার চুলের গোড়ায় নাপাকি থাকবে মনে করে সর্বদা মাথার চুল ছোট করে রাখা বা কামিয়ে রাখা:

নাপাকি থাকার ভয়ে এক শ্রেণীর মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন বা চুল খুব ছোট করে রাখেন এবং একে খুব ফযীলতপূর্ণ মনে করেন। আলী (রাঃ) এরূপ করতেন বলে তারা এর অনুসরণ করে থাকেন। অথচ উক্ত মর্মে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা যঈফ, মোটেই আমলযোগ্য নয়।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর এক চুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দিবে এবং উহা ধৌত করবে না তার সাথে আগুনের দ্বারা এই এই ব্যবস্থা করা হবে। আলী (রাঃ) বলেন, সেই অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। একথা তিনি তিনবার বললেন। তিনি তার মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন।[৬৩]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[৬৪] উক্ত বর্ণনার সনদে 'আত্বা, হাম্মাদ ও যাযান নামের ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ।[৬৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চুলের নীচেই অপবিত্র রয়েছে। সুতরাং চুলগুলোকে ভালভাবে ধৌত করবে এবং চামড়াকে সুন্দর করে পরিষ্কার করবে।[৬৬]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[৬৭] এর সনদে হারিছ ইবনু ওয়াজীহ নামক এক রাবী আছে। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, তার হাদীছ মুনকার আর সে দুর্বল রাবী।[৬৮]

৫৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৩৬-এর টীকা দ্রঃ ১/১৬৭ পৃঃ।
৬০. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৪৩, ২/১২৬ পৃঃ।
৬১. নাসাঈ হা/৯৪৭, ১/১১০ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৫, ২/৪৪।
৬২. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৯৫-এর টীকা দ্রঃ; নাসাঈ হা/৯৪৭; যঈফুল জামে' হা/৫০৩৪।
৬৩. আবূদাঊদ হা/২৪৯, ১/৩৩ পৃঃ; আহমাদ হা/১১২১; মিশকাত হা/৪৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮।
৬৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৪৪, ১/১৩৮ পৃঃ।
৬৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০, ২/২৩২ পৃঃ।
৬৬. আবূদাঊদ হা/২৪৮, ১/৩৩ পৃঃ; তিরমিযী হা/১০৬, ১/২৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫৯৭, পৃঃ ৪৪; আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭, ২/৯৭ পৃঃ।
৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১।

عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً-

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ, আমানত আদায় করা- এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা। আমি বললাম, আমানত আদায়ের অর্থ কী? তিনি বললেন, জানাবাতের গোসল করা। কারণ প্রতিটি পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা রয়েছে।[৬৯]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছও যঈফ।[৭০] এর সনদে উতবা ইবনু আবী হাকীম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[৭১]

(২৯) ঋতুবতী মহি'লা বা অপবিত্র ব্যক্তিদেরকে মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা:

অপবিত্র ব্যক্তি বা ঋতুবতী মহি'লা কুরআন স্পর্শ না করে মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারে।[৭২] মুখস্থও পড়া যাবে না বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা সঠিক নয়। অনুরূপ অপবিত্র ব্যক্তি সালাম-মুছাফাহা করতে পারে না, কোন বিশেষ পাত্র স্পর্শ করতে পারে না ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না বলে যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে তা কুসংস্কার মাত্র। আর এ ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ ও ভিত্তিহীন। যেমন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী লোক এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়বে না।[৭৩]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার। সে যঈফ হাদীছ বর্ণনা করেছে।[৭৪]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র না থাকলে প্রত্যেক অবস্থাতেই তিনি আমাদের কুরআন পড়াতেন।[৭৫]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি যঈফ।[৭৬]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পায়খানা হ'তে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। অপবিত্র ছাড়া কুরআন হ'তে তাকে কোন কিছু বাধা দিতে পারত না।[৭৭]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি যঈফ।[৭৮]

পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ:

নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হ'ল যেগুলো মানুষের মুখে মুখে খুবই প্রচলিত। অথচ তা যঈফ ও জাল বর্ণনা। এ সমস্ত বর্ণনা প্রচার করা উচিত নয়।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ-

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) যখন তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন আংটি খুলে রাখতেন।[৭৯]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি মুনকার ও যঈফ। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, 'এই হাদীছ মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য'।[৮০]

---

৬৮. الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف- যঈফ আবূদাঊদ হা/২৮৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৪৩, ১/১৩৮ পৃঃ।
৬৯. ইবনু মাজাহ হা/৫৯৮, পৃঃ ৪৪, 'পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৬।
৭০. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৯৮।
৭১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১, ৮/২৭২।
৭২. ছহীহ বুখারী হা/৩০৫ ও ৩০৬, 'ঋতু' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।
৭৩. তিরমিযী হা/১৩১; মিশকাত হা/৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২, ২/১০৮।
৭৪. سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ إِنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ كَأَنَّهُ ضَعَّفَ- যঈফ তিরমিযী হা/১৩১।
৭৫. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, বলূগুল মারাম হা/১০০।
৭৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬।
৭৭. আবূদাঊদ হা/২২৯; নাসাঈ হা/২৬৫; মিশকাত হা/৪৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১, ২/১০৭।
৭৮. ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮৫।
৭৯. আবূদাঊদ হা/১৯; তিরমিযী হা/১৭৪৬; নাসাঈ হা/৫২১৩; মিশকাত হা/৩৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৬, ২/৬২।
৮০. যঈফ আবূদাঊদ হা/১৯ - هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না সেই ঘরে, যাতে কোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি রয়েছে।[৮৭]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ।[৬৭]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ-

আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের ছালাত পড়েছি। অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছে দিতে, তোমার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত।[৬৮]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।[৬৯]

[চলবে]

৬৭. যঈফ আবুদাউদ হা/২২৭, ৪১৫২; যঈফ নাসাঈ হা/২৬১; মিশকাত হা/৪৬৩।
৬৮. ইবনু মাজাহ হা/৬৬৪, পৃঃ ৪৮; মিশকাত হা/৪৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৩, ২/৯৮।
৬৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬৬৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৪৯-এর টীকা দ্রঃ।

عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে তখন সে যেন পুরুষাঙ্গ তিনবার ঝেড়ে নেয়।[৮১]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে যাম'আহ ইবনু ছালেহ আল-জুনদী ও ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ নামক দুইজন দুর্বল রাবী আছে।[৮২]

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلاَةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ-

আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য ওযূ করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।[৮৩]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে মা'মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে দুইজন দুর্বল রাবী আছে।[৮৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক হ'তে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না।[৮৫]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে জাসরা বিনতে দিজাজা নামক একজন বর্ণনাকারী আছে সে অত্যধিক ত্রুটিপূর্ণ।[৮৬]

৮১. ইবনু মাজাহ হা/৩২৬; বলূগুল মারাম হা/৯০।
৮২. তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/১৯০৭৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬২১।
৮৩. দারাকুৎনী ১/৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৪২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫।
৮৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯; যঈফুল জামে' হা/৪৩৬১।
৮৫. আবূদাঊদ হা/২৩২; মিশকাত হা/৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩, ২/১০৮ পৃঃ।
৮৬. إسناده ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة كما قال الخطابي ومن هؤلاء: البيهقي وابن حزم، فقال هذا باطل وأبو محمد عبد الحق فقال لا يثبت. -যঈফ আবূদাঊদ হা/২৩২; ইরওয়াউল গালীল হা/১২৪, ১৯৩, ৯৬৮।
৮৭. আবুদাউদ হা/২২৭, ৪১৫২; নাসাঈ হা/২৬১; মিশকাত হা/৪৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৪, ২/১০৮।

মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের দো'আ ও অভিশাপ

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

উপক্রমণিকা :

ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র অন্যতম সৃষ্টি। তারা সব সময় আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করে থাকেন। তারা নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছুই বলেন না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হ'তে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতামণ্ডলী, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে' *(তাহরীম ৬)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেরেশতামণ্ডলী বিশেষ গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের জন্য দো'আ করে থাকেন। এ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হ'ল।-

১. মুমিন ও তাদের সৎ আত্মীয়দের জন্য :

কিছু এমন সৌভাগ্যবান লোক আছে, যাদের জন্য সম্মানিত ফেরেশতাগণ দো'আ করে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যারা আরশ বহনে রত এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা কর। হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হ'তে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হ'তে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে, এটাই তো মহা সাফল্য' *(গাফের/মুমিন ৭-৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ফেরেশতাগণের দরূদ :

ফেরেশতাগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করেন ও তাঁর জন্য দো'আ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও *(আহযাব ৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠকারীর জন্য :

যারা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশতারা তাদের জন্য দো'আ করেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلاَةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ- 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরেশতাগণ তার জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতএব বান্দারা অল্প দরূদ পাঠ করুক বা অধিক দরূদ পাঠ করুক (এটা তার ব্যাপার)'।[৮৮]

ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি :

যেসব সৌভাগ্যবান মানুষের জন্য ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : طَهِّرُوْا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَلَكٌ فِيْ شِعَارِهِ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের এই শরীরকে পবিত্র রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) রাত অতিবাহিত করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সঙ্গে রাত অতিবাহিত করবেন। রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই সে ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) ঘুমিয়েছে'।[৮৯]

* *এম.ফিল গবেষক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

৮৮. *আল-মুসনাদ হা/৬৬০৫, ১০/১০৬-১০৭, হাদীছ হাসান। দ্রঃ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২/৪৯৭; মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৬০; আল-কাউলুল বাদী, ১৫৩ পৃঃ।*

৮৯. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১মখণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪০১), পৃঃ ৪০৮-৪০৯; হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী হাদীছটিকে জাইয়িদ বলেছেন। দ্রঃ ফাতহুল বারী, ১১তম খণ্ড (সঊদী আরব: রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ), পৃঃ ১০৯।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হ'লেও ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنًا بَاتَ طَاهِرًا-

'যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) ঘুমায় তার সঙ্গে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, সে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে'।[৯০]

ছালাতের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লীবৃন্দ :

ওযূ অবস্থায় ছালাতের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লীদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلَاة مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ أَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন ওযূ অবস্থায় ছালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, তার জন্য ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার উপর কল্যাণ দান কর'।[৯১]

প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দ :

প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দের জন্য ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ-

'প্রথম কাতারের মুছল্লীদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন ও ফেরেশতামণ্ডলী তাদের জন্য দো'আ করবেন'।[৯২]

কাতারের ডান পার্শ্বের মুছল্লীবৃন্দ :

কাতারের ডান পার্শ্বের মুছল্লীবৃন্দের জন্য ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়া করেন ও ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করেন ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর'।[৯৩]

কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দ :

কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়া করেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী দো'আ করেন, যারা একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে'।[৯৪]

এ কারণে ছাহাবীগণ জামা'আতে ছালাত আদায়কালীন পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়ানোতে গুরুত্ব দিতেন। বিশিষ্ট ছাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন,

وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ-

অর্থাৎ 'আমাদের সবাই ছালাতে একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম'।[৯৫] রাসূল (ছাঃ) ছালাত আরম্ভের পূর্বে মুছল্লীদের দিকে তাকিয়ে বলতেন,

---

৯০. আমীল আলাউদ্দীন ফারেসী, আল-ইহসান ফী তাক্বরীবি ছহীহ ইবনে হিব্বান, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৩২৮-২২৯; হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৪০৯ হিঃ) পৃঃ ৩১৭।

৯১. ছহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড (সঊদী আরব: রিয়াসাতু ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০০ হিঃ), পৃঃ ৪৬০, হা/৬১৯।

৯২. আল-ইহসান ফী তাক্বরীবি ছহীহ ইবনে হিব্বান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩০-৫৩১; হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/১৮৩৯।

৯৩. আল-ইহসান ফী তাক্বরীবি ছহীহ ইবনে হিব্বান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪; সুনানু আবী দাউদ আওনুল মাবুদসহ, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হিঃ), পৃঃ ২৬৩; হাদীছ হাসান, দ্রঃ ছহীহ আবু দাউদ হা/৬৮০।

৯৪. ছহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৫৩৬ পৃঃ; হাদীছ হাসান, ছহীহ। দ্রঃ ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৫০১, ১/২৭২ পৃঃ।

৯৫. ছহীহ বুখারী ফাতহুল বারী সহ, ২য় খণ্ড (সঊদী আরব: রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ তাবি), পৃঃ ২১১।

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمَنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ-

'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর তিনবার বলতেন। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কাতারকে সোজা কর, অন্যথা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে বক্রতা সৃষ্টি করবেন'।[৯৬] বর্ণনাকারী কাতার সোজা করার নিয়মাবলী এভাবে বর্ণনা করেন,

فَرَايْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ-

অর্থাৎ আমি দেখেছি যে, ব্যক্তি তার নিজের কাঁধ অপরের কাঁধের সাথে, হাঁটু অপরের হাঁটুর সাথে এবং পা অপরের পায়ের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াত।[৯৭]

ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে আমীন পাঠকারীবৃন্দ :

ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করলে আমীন বলা শরী'আত সম্মত। এ সময় ফেরেশতামণ্ডলীও আমীন বলে থাকেন। ইমাম ও মুছল্লীদের আমীন এবং ফেরেশতাদের আমীন মিলে গেলে গোনাহ মাফ হয়। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

'ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার অতীত জীবনের গোনাহগুলিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৯৮]

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর ফেরেশতাগণ সমবেত মুছল্লীদের জন্য আমীন বলে আল্লাহ্র সমীপে সুপারিশ করে থাকেন, যার অর্থ হ'ল, হে আল্লাহ! আপনি ইমাম ও মুছল্লীদের সূরা ফাতিহায় বর্ণিত দো'আ সমূহ কবুল করুন। কারণ আমীন অর্থ হ'ল আপনি কবুল করুন'।[৯৯]

ছালাত শেষে ওযূসহ স্বস্থানে অবস্থানকারীবৃন্দ :

ছালাত শেষে ওযূসহ যেসব মুছল্লী স্বীয় স্থানে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَي أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّي فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَاللَّهُمَّ أَرْحَمهُ-

'তোমাদের মধ্যে যারা ছালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে, তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওযূ ভঙ্গ না হবে, (তারা বলেন,) হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর দয়া করুন।[১০০]

জামা'আতে ফজর ও আছর ছালাত আদায়কারীর জন্য :

যারা ফজর ও আছর ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَجِئْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، فَإِذَا عَرَجَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ قَالُوْا جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَجِئْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ ফজর ও আছরের ছালাতে একত্রিত হন। দিনের ফেরেশতা যখন উপরে উঠে যান, তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে? তারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের নিকট থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমরা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তাদেরকে ছালাত রত পেয়েছিলাম এবং যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে ছালাত রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। অতঃপর যখন রাতের ফেরেশতাগণ উপরে উঠে যান, তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে? তারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের নিকট থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমরা

---

৯৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১।
৯৭. প্রাগুক্ত; ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১।
৯৮. বুখারী, হা/৭৮২, 'আযান' অধ্যায়, 'মুক্তাদীদের জোরে আমীন বলা' অনুচ্ছেদ।
৯৯. ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬২।
১০০. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬তম খণ্ড (বৈরুত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৩২, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৬৭২৭।

যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তাদেরকে ছালাত রত পেয়েছিলাম এবং যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে ছালাত রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি'।[১০১]

মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য প্রার্থনাকারী :

সাফওয়ান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সন্ধ্যা উপনীত হ'লে আমি আবুদ দারদার ঘরে উপস্থিত হ'লাম, কিন্তু আমি তাকে ঘরে পেলাম না। উম্মুদ দারদা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, এ বছর তোমার কি হজ্জ করার ইচ্ছা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য দো'আ করবে। কেননা নবী (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ-

'কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দো'আ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখনই সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দো'আ করে তখন সেই নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, 'আমীন' অর্থাৎ হে আল্লাহ! কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে, আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন)।

সাফওয়ান (রাঃ) বলেন, তারপর আমি বাজারে গেলাম, সেখানে গিয়ে আবুদ দারদা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম, তিনিও নবী (ছাঃ) হ'তে একই রকম হাদীছ শুনালেন।[১০২]

ফেরেশতাদের দো'আ পাওয়ার প্রত্যাশায় অতীত যামানার মনীষীগণ অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দো'আ করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

কুরআন মাজীদে সেই মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা অতীত মুমিনদের জন্য দো'আ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

'যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকের ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু ও পরম করুণাময়' *(হাশর ১০)*।

কল্যাণের পথে ব্যয়কারীদের জন্য :

সেসকল লোক যারা কল্যাণের পথে ব্যয় করে থাকেন, তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন। নিম্নের হাদীছ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন, একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও'।[১০৩]

এই হাদীছে নবী (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, ভাল পথে ব্যয়কারীর জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন যে, আল্লাহ তাদের খরচকৃত সম্পদের প্রতিদান দান করুন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ফেরেশতাদের দো'আয় যে (خلف) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হ'ল মহাপুরস্কার।[১০৪]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চমৎকার কথা বলেছেন যে, ফেরেশতাদের দো'আয় সৎপথে ব্যয় করার পুরস্কার নির্দিষ্ট নয়। কেননা এর তাৎপর্য হ'ল যাতে করে এতে সম্পদ, ছওয়াব ও অন্যান্য জিনিসও শামিল হয়। সৎপথে ব্যয়কারীদের অনেকেই উক্ত সম্পদ ব্যয়ের প্রতিদান পাওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন

১০১. আল-মুসনাদ হা/৯৪১০, ১৭/১৫৪; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/৩২২, ১/১৬৫; আল-ইহসান ফি তাক্বরীব। ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০৬১, ৫/৪০৯-৪০১০; হাদীছ ছহীহ। *দ্রঃ* ছহীহুল জামে' হা/৮০১৯।

১০২. ছহীহ মুসলিম হা/৮৮ (২৭৮৮), ৪/২০৯৪।

১০৩. বুখারী হা/১৪৪২, ৩/৩০৪; মুসলিম হা/৫৭ (১০১০), ২/৭০০।

১০৪. মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪র্থখণ্ড (মক্কা: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, তাবি), পৃঃ ৩৬৬।

এবং প্রতিদান নেকীর আকারে পরকালে অবধারিত হয়। অথবা উক্ত খরচের বিনিময় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।[১০৫]

আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَا طَلَعَت شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَان يُنَادِيَان يُسْمِعَان أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَان يُنَادِيَان يُسْمِعَان أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

'প্রতিদিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে অগ্রসর হও। পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ, উদাসীন ব্যক্তির অধিক সম্পদ হ'তে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। অনুরূপ সূর্যাস্তের সময় তার পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।[১০৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مَلَكَان بِبَاب مِّنْ أَبْوَاب الجَنَّه يَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ الْيَوْمَ يَجزُ غَدًا وَمَلَكٌ بِبَاب آخَرَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

'জান্নাতে দরজার পার্শ্বে এর ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামীকাল (ক্বিয়ামত দিবসে)। আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও'।[১০৭]

সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য :

যারা ছিয়াম রাখার নিয়তে সাহরী খায় তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন'।[১০৮]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السَّحُوْرُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوْهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে, সাহরী কখনো ছাড়বে না যদিও এক ঢোক পানি পান করেও হয়। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাহরী গ্রহণকারীদের উপর দয়া করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন'।[১০৯]

রোগী দর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনাঃ

যারা কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلاَّ ابْتَعَثَ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْه مِنْ أَيِّ سَاعَات النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান রোগী

---

১০৫. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড (সঊদী আরব: রিয়াসাতু ইদারাত, তাবি), পৃঃ ২০৫।

১০৬. আল-মুসনাদ ৫/১৯৭; আল-ইহসান ফি তাকরিব ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩২৯, ৮/১২১-১২২; আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহায়ন ২/৪৪৫, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৪৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৫৬।

১০৭. আল-মুসনাদ ২/৩০৫-৩০৬; আল-ইহসান ফী তাকরীব ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩৩৩, ৮/১২৪; সিলাসিলা ছহীহাহ হা/৯২০।

১০৮. আল-ইহসান ফি তাকরীব ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৪৬৭, ৮/২৪৬, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫১৯; সিলাসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪।

১০৯. আল-মুসনাদ হা/১০৬৬৪; সিলাসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৯।

ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা প্রেরণ করেন, তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ তথা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ তথা সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন'।[১১০]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا بَكَرًا شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেল তার সাথে সত্তর হাযার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রোগীকে দেখতে গেল, তার সাথে সত্তর হাযার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়'।[১১১]

রোগী দেখতে যাওয়ার ছওয়াব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখিত হ'ল-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ، غَمَرَ فِيْهَا-

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রোগী দেখতে গেল, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমতে আচ্ছন্ন থাকল এবং যখন সে রোগীর কাছে বসে তখন সে রহমতের ভিতরে ডুবে থাকে'।[১১২]

মোল্লা আলী কারী এ হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেন, রোগী দেখার নিয়তে নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ্র রহমতে প্রবেশ করে থাকে। فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ যখন সে রোগীর কাছে বসে, তখন সে আল্লাহ্র রহমতে ডুবে যায়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, اغْتَمَسَ فِيْهَا রহমতের মাঝে সে ডুবে হাবুডুবু খেতে থাকে।[১১৩]

রোগী দর্শনের জন্য যাওয়ার সময়ই শুধু রহমতে আচ্ছন্ন হয় না বরং বাড়ীতে ফেরার সময়ও তাকে আল্লাহ রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। উপরোল্লেখিত হাদীছের শব্দ, لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَرْجِعَ বাড়ী ফেরা পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমতে প্রবেশ করে তা প্রমাণ করে। এছাড়া আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهُ فَلاَ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَرْجِعَ حَيْثُ خَرَجَ- 'যখন সে রোগীর কাছ থেকে রওয়ানা হয় তখনও আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত যেখান থেকে সে এসেছে, সেখানে ফিরে না আসে'।[১১৪] পক্ষান্তরে রোগীর দেখাশুনা না করলে শাস্তি পেতে হবে। এমর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগে আক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি সারা বিশ্বের রব, আমি আপনার সেবা কিভাবে করব? তিনি বলবেন, তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত ছিল?

---

১১০. *আল-মুসনাদ হা/৮১৫, আল-ইহসান ফী তাকরীব ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৯৫৮, ৭/২২৪-২২৫, হাদীছ ছহীহ, সিলাসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬৭।*

১১১. *আল-মুসনাদ হা/৯২৮, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৭।*

১১২. *আল-মুসনাদ হা/৩০১৮, হাদীছ ছহীহ,ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৪৭৭।*

১১৩. *মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৫২।*

১১৪. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২৯৭।*

তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে সেখানেই আমাকে পেতে'।[১১৫]

রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট উক্তির উপর ফেরেশতাদের আমীন বলা :

রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট যা বলা হয় তা কবুল হওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ-

উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথা বলবে, কেননা ফেরেশতাগণ তা কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলে থাকেন'।[১১৬]

রোগীর নিকটে গেলে আল্লাহ তা'আলার নিকটে তার রোগ মুক্তির জন্য দো'আ কর এবং মৃত ব্যক্তির নিকট গেলে তার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে। অনুরূপ যে জায়গায় যাও নিজের জন্য ভাল কথাই বলবে।[১১৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, এ ধরনের স্থানে যেন উত্তম কথা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট রোগী বা মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় এবং তার প্রতি যেন মেহেরবানী, সহজ ও নরম ব্যবহার করা হয়, সেজন্য দো'আ করা হয় তা কবুল হওয়ার জন্য তারা আমীন বলে থাকেন।[১১৮]

সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য :

যারা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দেয় তাদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন। যেমন-

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হ'ল, যাদের একজন আলেম, অপরজন আবেদ (ইবাদতকারী)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আবেদের তুলনায় আলেমের মর্যাদা হ'ল যেমন তোমাদের সর্বনিম্ন লোকের তুলনায় আমার মর্যাদা'।[১১৯] তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ-

'নিশ্চয়ই মানুষকে ভাল কথা শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশতাগণ, আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপিলিকা ও পানির মৎসও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে'।[১২০]

হাদীছে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রাঃ) বলেন, সেটা এমন শিক্ষা যার সাথে মানুষের মুক্তি জড়িত। রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ক্ষমার উল্লেখ করেননি; বরং مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ অর্থাৎ মানুষের উত্তম শিক্ষা দাতার কথা বলেছেন। যেন এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্ষমার উপযুক্ত ঐ শিক্ষক যিনি মানুষকে কল্যাণের পথে পৌঁছার জন্য ইলম শিক্ষা দান করে থাকেন।[৩৪]

[চলবে]

৩৪. *মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৪৭৩।*

১১৫. *ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৬১।*
১১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৭।*
১১৭. *মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৮৪।*
১১৮. *শারহ নববী ৬/২২২।*
১১৯. *জামে তিরমিযী হা/২৬০৯, হাদীছ ছহীহ, ছহীহ সুনানে তিরমিযী ২/৩৪৩।*
১২০. *প্রাগুক্ত।*

সর্বনাশের সিঁড়ি

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

বিশ্ব রাজনীতি স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকার পাঁচটি, যথা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। মনুষ্যজীবনে এগুলি এমনি আবশ্যক, এর একটিও পরিহার্য নয়। আবার ইসলাম ধর্মও পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা- কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত এবং হজ্জ। ইসলাম থেকে এর একটিও পরিহার্য নয়। এই নিয়মে আমি সর্বনাশের পাঁচটি সিঁড়ি চিহ্নিত করতে চাই, যথা- সূদ, ঘুষ, পর্দাহীনতা, টেলিভিশন এবং মোবাইল। এগুলির পরিণাম সর্বনাশ। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই তাকে বলেছি সর্বনাশের সিঁড়ি। যেহেতু এসবের মাধ্যমেই সর্বনাশ আসে।

প্রথমেই সূদের কথা বলা যাক। সূদের বিনিময়ে যারা টাকা লগ্নী করে, তারা একে ব্যবসা বলে। আর এটি এমনই ব্যবসা যাতে ব্যবসায়ের দু'টি মূলনীতি কিংবা পরিণামের একটি অনুপস্থিত। অর্থাৎ এতে লোকসান নেই। অথচ ব্যবসায়ে লাভ এবং লোকসান দু'টিই থাকার কথা। আবার লাভ-লোকসান বরাবর অপরিবর্তিত থাকারও কথা নয়। কিন্তু সূদের বেলায় শুধু লাভই থাকে এবং তা অপরিবর্তিত। এ কারণে সূদকে ব্যবসা বলার কোন যুক্তি নেই। বরং শোষণের হাতিয়ার বা পন্থা বলাই সংগত। সূদে আবার সূদের সূদ, তস্য সূদ অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধির সুযোগটাও রয়েছে। তবু সূদ আন্তর্জাতিক। সেকারণে গণিতশাস্ত্রেও তার স্থান রয়েছে। অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে সূদ কষার নিয়ম শেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সূদের ব্যবসায়ে লোকসান নেই বলেই লগ্নীকারীরা এতে অর্থ লগ্নী করে। কিন্তু সূদে অর্থ গ্রহীতারা সবাই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এ ঋণ গ্রহণ করে, তা নয়। অনেক অর্থশালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সূদী ঋণ গ্রহণ করে। তার ফলে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। অধিক মুনাফা করতে পারায়, তাদের ধন বৃদ্ধি পায়। আর ধন বৃদ্ধির সংগে পাল্লা দিয়ে অহেতুক বিলাস-ব্যসনের মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়। যারা অধিক টাকা না থাকার কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা আদৌ টাকা না থাকায় ব্যবসা করতে পারে না, তারা সূদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে। প্রায়শঃ দেখা যায়, এ ধরনের ব্যবসায়ীরা পরিণামে ব্যবসায়ে ফেল মারে। তার কারণ হিসাবে জানা যায় যে, আয়ের চাইতে ব্যয় অধিক করার ফলেই পরিণামটা এরূপ হয়।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে প্রচুর এনজিও রয়েছে, যারা কিস্তিতে সূদ পরিশোধ (আসলের অংশ সহ) চুক্তিতে ঋণ প্রদান করে। আবার গ্রামের লোকেরাও অনুরূপ ঋণদান সমিতি গড়ে তুলেছে। তারাও এনজিওর মতো সূদ এবং কিস্তি পরিশোধের নিয়মে ঋণ প্রদান করে। এমনও দেখা যায়, অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এনজিও কিংবা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তেমন কোন ব্যবসা না করে ঘরের চালে টিন দেয়, টেলিভিশন ক্রয় করে। এভাবে অর্থ ব্যয়ে কিছুটা বিলাসী জীবন-যাপনের চেষ্টা করে। অতঃপর খেয়ে-না খেয়ে কিস্তি পরিশোধের চেষ্টা করে। পরিশেষে কিস্তি খেলাপের কবলে পড়ে কেউবা পৈত্রিক ভিটেবাড়ী বিক্রি করে ঋণ পরিশোধে বাধ্য হয়। কেউবা ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায় শহরে। কেউবা আত্মহত্যা করে রেহাই পায়। এরূপ ঘটনা কখনও কখনও আমাদের কর্ণগোচর হয়। আবার বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরও কেউ কেউ ঋণ খেলাপী হয়ে পড়ে। অতএব সূদকে সর্বনাশের সিঁড়ি বলতে বাধা কোথায়? সূদ হারাম হ'লেও বহু দেশে সরকারী আইনে তা সিদ্ধ। অবশ্য সর্বনাশটা কারো কখনও কাম্য নয়। কিন্তু সর্বনাশটা প্রায়শঃ হয়ই। আর এই সূদের কারবারে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ডঃ ইউনুস। অথচ সূদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা কর্য দিয়ে ক্রমবর্ধমানহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা রক্ষা পাবে' *(আলে ইমরান ১৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ প্রদানকারী, তার লেখক এবং সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন; তারা সকলেই সমান *(মুসলিম)*।

জনগণ কর্তৃক গঠিত হয় সরকার। সরকার নিয়োগ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের বেতন-ভাতা জনগণ প্রদত্ত ট্যাক্সের দ্বারা নির্বাহ হয়। আসলে তারা জনগণেরই সেবক। এ কারণে তাদেরকে বলা হয় পাবলিক সার্ভেন্ট (Public servant)। জনগণের কাজ করার জন্যই তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে বেতনের বিনিময়ে। তারা তাই জনগণের কাজ করতে বাধ্য। কিন্তু অধুনা আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি যে, ঘুষ না দিলে কোন সরকারী অফিসে কাজ পাওয়া যায় না। ঘুষ অবৈধ, অনৈতিক, বেআইনী। ধর্ম বিধিতে তো নিষিদ্ধ বটেই। তবু দৈনন্দিন বাজার দরের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুষের পরিমাণও বেড়েই চলেছে। ঘুষ না দিলে অফিসের কোন ফাইল নড়ে না, লাল ফিতার বাঁধন খোলে না, চাকুরী হয় না, পদোন্নতি, ইনক্রিমেন্ট, পেনশন আটকে থাকে। এটা সর্বজনবিদিত। আর ঘুষের আদান-প্রদানে গোপনীয়তা রক্ষিত হয় বলে, এর বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও যায় না। সূদের বেলায় ইসলামী বিধানে দাতা-গৃহীতা উভয়ে সমান অপরাধী। অবশ্য সরকারী আইন-বিধানে কারো অপরাধ হয় না। কিন্তু ঘুষের বেলায় উভয়েই

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

সমান অপরাধী আইনের চোখেও। কেননা সবাই দায়ে ঠেকে ঘুষ দেয় না। কেউ কেউ অবৈধ কাজকে বৈধ করার জন্য ঘুষ দেয়, অন্যায়কে ঢাকার জন্য ঘুষ দেয়, অপ্রাপ্যকে পাওয়ার জন্য ঘুষ দেয়। এ ধরনের ঘুষ দাতা অবশ্যই ঘুষ গ্রহণকারীর সমানই অপরাধী। এরা ন্যায্য পাওনাদারকে বঞ্চিত করে। এদের কারণে অপরাধী মুক্তি পায়, নিরপরাধ শাস্তি ভোগ করে। তাই ঘুষকে শুধু অপরাধ বললেই চলে না। এটা নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, নিগ্রহ, মানবতার চরম লংঘন। অথচ ঘুষখোরদের নেটওয়ার্ক অধুনা সুদূরপ্রসারী। এদেরও ইউনিয়ন বা সিন্ডিকেট রয়েছে। ইসলামে এই ঘুষ আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ করি, তাকে সেজন্য বেতন দেওয়া হবে। এ ব্যতীত সে যা গ্রহণ করবে, তা বিশ্বাসঘাতকতা *(আল হাদীছ)*। যে বা যারা ঘুষ খায় বা দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। *(আবুদাঊদ)*।

আমাদের দেশে ঘুষ-বাণিজ্য শুধু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আধা সরকারী, বেসরকারী এবং পাবলিকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। যার হাতেই কিছু কাজ বা ক্ষমতা থাকে, সে-ই ঘুষ দাবী করে। মাস্তানেরা চাঁদাবাজি করে। তাও এক রূপ ঘুষই। তফাৎটা এই যে, অফিসের ঘুষ না দিলে প্রাণ নাশের হুমকী থাকে না, থাকে কাজ না পাওয়ার সমস্যা। আর চাঁদাবাজদের বক্তব্য, 'গাড়ী করছ, বাড়ী করছ, ব্যবসা করছ তো চাঁদার টাকাটা ফ্যালো, নইলে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে'। তাই একে চাঁদা বলা হয়, ঘুষ বলা হয় না। আবার গ্রামে-গঞ্জে একদল প্রভাবশালী মাতব্বর শ্রেণীর লোক থাকে, তাদের কাছ থেকে শালিশ-মীমাংসা পেতে চাইলে কিছু সেলামী দিতে হয়। এও এক প্রকার ঘুষ। পাড়া-প্রতিবেশীর কোন না কোনভাবে একটু উপকারের বিনিময়ে এরূপ অর্থগ্রহণ অমানবিক, অনৈতিক। কখনও কখনও এরা সরকারী অফিস-আদালতের দালালীও করে। এদেরকে ভদ্র ভিক্ষুক বললেও ক্ষতি নেই। এরাও গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষকে কম ক্ষতিগ্রস্ত করে না। অনেক সময় এরা তাদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সহজ কাজকে জটিল করে তোলে। এলাকায় কলহ-কোন্দল দীর্ঘমেয়াদী করে রাখে।

প্রত্যেক জীবের শরীরে একটা আবরণ থাকে। তাকে বলা হয় চর্ম। বৃক্ষেরও শরীরে আবরণ থাকে। তাকে বলা হয় বল্কল। চর্ম এবং বল্কল স্পর্শকাতর শরীরকে Protection দেয়। আদিম অসভ্য যুগে মানুষ উলঙ্গ থাকতো বলে জানা যায়। এক সময়ে আদিম মানুষেরা উপলব্ধি করে যে, তাদের উলঙ্গ থাকা ঠিক নয়। তখন থেকে তারা গাছের বাকল, পাতা এবং লতা ব্যবহার করতো। আরো ব্যবহার করতো পশুর চামড়া। এসব তারা ব্যবহার করতো লজ্জা নিবারণের প্রয়োজনে। তাহ'লে ধরে নিতে পারি যে, তাদের মধ্যে সে কালেই লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

সভ্যতার উন্মেষ এবং অগ্রগতি মানুষকে জ্ঞানী, মার্জিত এবং রুচিশীল করেছে। তারা কাপড় বুনতে এবং পোষাক তৈরী করতে শিখেছে। তখনই তারা সামাজিক জীবে পরিণত হয়েছে। আর পোষাক পরা তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি পোষাক নাযিল করেছি তোমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য এবং শোভার জন্য, আর পরহেযগারীর পোষাকই উত্তম *(আ'রাফ ২৬)*।

বর্তমান সভ্যযুগের মানুষ তিনটি প্রয়োজন মেটাতে পোষাক পরিধান করে, যথা- লজ্জা নিবারণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এবং সৌন্দর্য বর্ধন। ইসলামী বিধান মতে লজ্জা নিবারণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। হাদীছে বলা হয়েছে, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'। ইসলামী বিধান পুরুষ এবং নারীর সতর (লজ্জাস্থান) নির্ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- পুরুষের সতরের সীমারেখা নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং নারীর ক্ষেত্রে সতর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতীত সর্বাঙ্গ। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, নারীর প্রায় সর্বাঙ্গ স্পর্শকাতর। খোলামেলাভাবে সেদিকে পুরুষের দৃষ্টি নিপতিত হ'লে তাদের লালসা-কাতর হয়ে পড়া স্বাভাবিক। এটা আল্লাহ প্রদত্ত। তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই নারী এবং পুরুষের নির্ধারিত সতর আবৃত রাখার বিধান দিয়েছে ইসলাম। একেই সহজ কথায় বলা হয় পর্দা। আর এ পর্দা রক্ষার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের মূর্খতার যুগের ন্যায় সাজ-সজ্জা করে ঘুরে বেড়াবে না' *(আহযাব ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দাইয়ুছ (যারা বেপর্দায় চলে এবং চালায়) জান্নাতে যাবে না *(আল হাদীছ)*।

এক সময়ে আমাদের দেশে নারীদেরকে নাভী থেকে নিম্নোদর অনাবৃত রেখে শাড়ী পরতে দেখা গেছে। এই আধুনিক ফ্যাশনকে বলা হ'ত অজান্তা-স্টাইল। বস্তুতঃ এটা আধুনিকতা নয়, বরং আদিমতা। শোনা যায়, অজান্তা-ইলোরা-কোনারকের মন্দির গাত্রে প্রাচীন গুহাচিত্রের আদলে এই রকমের অর্ধনগ্ন নারী উৎকীর্ণ রয়েছে। তাই দেখে শাড়ী পরার এই স্টাইলটি এসেছে। প্রথমে এটা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়। পরে মুসলমান সমাজেও প্রবিষ্ট হয়। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এটা উচ্ছেদ হয়েছে নারীদের সালোয়ার-কামিজ ব্যবহারের ব্যাপকতার কারণে। তাতেও আবার দেখা যায় কামিজের গলা সামনে-পিছনে কিছুটা বেশি করে কাটা, যাতে বুক-পিঠের কিয়দংশ অনাবৃত থাকে। আবার

সালোয়ারের নিচের দিকের জোড়ায় কিয়দংশ সেলাই বিহীন রাখা হয়, যাতে পায়ের নলার কিছু অংশ দেখানো যায়। নারীদের এই ধরনের পোষাক পরে পুরুষদের সামনে চলাফেরা করলে পুরুষের মানসিক অসুস্থতার কারণ ঘটে। দেখা যাচ্ছে, পুরুষদের চাইতে বরং নারীরাই শরীরের অধিকাংশ স্থান অনাবৃত রাখে। একেই বলবো, পর্দাহীনতা। এই পর্দাহীনতা নারীর পক্ষে তো ক্ষতিকর বটেই, পুরুষদের জন্যও ক্ষতির কারণ। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে আমাদের দেশের বিতর্কিত বেহায়া লেখিকা তসলিমা নাসরিন লিখেছে, 'গরমের কারণে পুরুষ যদি গায়ের জামা খুলে ফেলতে পারে, নারী কেন পারবে না'। তসলিমা নাসরিনের জানবার কথা যে, অনাবৃত নারীর পুরুষ কর্তৃক উত্যক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, পুরুষের তা থাকে না।

পথে-ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিস-আদালতে পর্দাহীন নারীর অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। আর সর্বত্রই যে অল্পাধিক নারী নির্যাতন ঘটে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু কেন নারীর পর্দাহীনতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে? কেন পর্দাহীন নারীর দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটানো হচ্ছে? এর ফলে পরিবার এবং সমাজ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীরাও। পর্দাহীনতার কুফল হিসাবে সম্প্রতি শুরু হয়ে ইভটিজিং। হাটে-ঘাটে পথে-প্রান্তরে বখাটে কর্তৃক ইভটিজিং বা উত্যক্তের শিকার হচ্ছে নারী। এর পরও আমাদের হুঁশ ফিরছে না।

টেলিভিশন বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এর দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করছে। কিন্তু এর ক্ষতির দিকটাও একেবারে অল্প নয়। ডিস এন্টেনা সংযোগের ফলে স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্নমুখী অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও প্রায় প্রতিঘরে টেলিভিশন রয়েছে। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে, টেলিভিশন দেখার কোন সময় অসময় বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। ঘরে ঘরে টেলিভিশন চালানো হচ্ছে সকাল-দুপুর গভীর রাতে, ছালাতের ও আযানের সময়ে। হয়তো কোন বাড়ীতে এক ঘরে রোগাক্রান্ত অসুস্থ মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, অন্য ঘরে তখন ফুল পাওয়ারে টেলিভিশন চালানো হচ্ছে। হয়তো পাশের বাড়ীতে কারো মৃত্যুতে কান্নার রোল, তখনও কোন বাড়ীতে টেলিভিশন চলছেই। টেলিভিশন আসক্তি মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তুলেছে। টেলিভিশন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, ধর্ম-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। বাড়াচ্ছে অশান্তি এবং বিশৃংখলা। হরণ করছে একে অন্যের অধিকার।

টেলিভিশনের পর্দায় যৌনাবেদনের দৃশ্য সম্বলিত নাচ-গান-অভিনয় দেখার সুযোগ রয়েছে। এ্যাডফিল্মে অর্ধ নগ্ন মহিলাদের অশালীন অঙ্গভঙ্গী দেখা যাচ্ছে। এসবের মাধ্যমে আমাদের তরুণ-তরুণীদের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। এ জাতীয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান মানুষকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না' *(বানী ইসরাঈল ৩২)*। টেলিভিশনের এই অসুস্থ বিনোদন মানুষকে শুধু অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর করাচ্ছে। বলতেই হবে যে, টেলিভিশন অধুনা সর্বনাশের সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ এখন টেলিভিশনের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের হিতাহিত জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটেছে। এ যেন ভাসুর মানে না, শ্বশুর মানে না, এমনি অবস্থা। প্রতিকারের কোন উপায়ও নেই। কেননা টেলিভিশন ওয়ালারা তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করছে। তাদের কে থামাবে? তাই বাড়ীর মধ্যে গভীর রাতে টেলিভিশনে বিশ্বকাপের ফুটবল খেলায় গোল হ'তে দেখে ষাড়ের মতো কোরাসে চেঁচাতে সাহস পাচ্ছে। তারা জানে না যে, অপরের শান্তি ভঙ্গের কারণ ঘটিয়ে নাগরিক অধিকার ভোগ করা আইনসম্মত নয়।

মোবাইল ফোন একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এ থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে টেলিভিশনের চাইতেও অধিক। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে যেকারো সঙ্গে যখন-তখন কথা বলা যায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের কোন বিকল্প নেই। এটা সহজে বহনযোগ্য। হাতে কিংবা পকেটে রেখে যত্রতত্র যাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের জন্য তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগের আবশ্যক হয় না। এর দ্বারা ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা, রেডিও-টেলিভিশনের কাজ চালানো সম্ভব। কিঞ্চিৎ কম্পিউটারের কাজও চলে। সম্প্রতি মোবাইল ফোন খুবই জনপ্রিয় এবং প্রায় সকলেই ব্যবহার করছে। চলার পথেও মানুষকে মোবাইল ফোনে গান শুনতে দেখা যাচ্ছে। মোবাইল ফোনের উপকারিতা যেমন অপরিসীম, ক্ষতির মাত্রাটাও তেমনি। এখানে ক্ষতির খতিয়ানটা উদ্ধৃত করছি- (১) মোবাইলে ব্লুফিল্মসহ আপত্তিকর ছবি দেখার সুযোগ আছে। (২) মোবাইলে কাউকে উত্যক্ত করা, হুমকী দেওয়া চলে। (৩) এর দ্বারা কাউকে প্রতারিত করা সহজ। (৪) মোবাইলের মাধ্যমে অশ্লীল আলোচনা এবং অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন সহজসাধ্য। (৫) নিষিদ্ধ কিংবা আপত্তিকর কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া অনেক দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনতে পাই। যেমন- বখাটে লম্পট যুবকেরা মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কোন যুবতীর সঙ্গে আলাপ জমায়। হয়তো সেই যুবতী পূর্ব পরিচিতাও নয়। আলাপের এক পর্যায়ে ফোনের মাধ্যমে স্থান নির্ধারণ করে গোপনে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। অতঃপর ধর্ষণ, গণধর্ষণ, বেশ্যালয়ে বিক্রি, বিদেশে পাচার, এর যেকোন একটি ঘটে যেতে পারে। এরূপ যে হয়, এমন খবরও কখনও কখনও শোনা যায়।

আজকাল গ্রামে-গঞ্জেও বহু তরুণ-তরুণীর হাতে মোবাইল কোন দেখা যায়। অনেকে পড়াশুনা ফেলে রেখে ফোনালাপে মগ্ন থাকে। এভাবেই গড়ে ওঠে নিষিদ্ধ ভালবাসা। তার ফলে পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকটা অনেক অভিভাবক ভেবে দেখে না। ছেলে-মেয়েরা আবদার করলেই একটা মোবাইল ফোন কিনে দেয়। মোবাইল ফোন পেয়ে ছেলে-মেয়ে তা কী কাজে ব্যবহার করে তার খোঁজ রাখে না কিংবা খোঁজ রাখার সুযোগ পায় না। ছেলে-মেয়েরা গোপনে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার করে চলে। এভাবেই নেমে আসে সামাজিক অবক্ষয়, চরিত্র হনন। পেয়ে যায় সর্বনাশের সিঁড়ি। তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে অনৈতিকতার দিকে। আমি বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কারকে নিন্দাবাদ করছি না। যা বলেছি তা তার ব্যাপক অপব্যবহারের দিকটা লক্ষ্য করেই বলেছি। দেখা যাচ্ছে, যা দ্বারা আমরা উপকৃত হই, তাই আবার ভয়ানক ক্ষতির কারণ ঘটায়। আমরাতো সবাই বস্তুর Merit নিয়ে তুষ্ট থাকি না, Demerit-কেও গ্রহণ করছি। তাই উপকারী বস্তু থেকেও আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। এটাও ভেবে দেখা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য প্রতিরোধ, প্রতিকারের বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে।

অন্য ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে মুসলমানদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তাদের ধর্ম ইসলাম। এ ধর্ম আল্লাহ প্রেরিত অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সুসংহত। আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনকে মানবজাতির সংবিধান হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত এবং এটিই আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব। এই কিতাব আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এই কিতাবের বিধানাবলীকে বলা হয়, শরী'আত। এ আইন বিধান পাওয়া যায় নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহেও। অতএব মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে। এই বিধানাবলী তাদের কাছে অলংঘনীয়। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা সেই কিতাবের উপর ঈমান আনে, আর যারা এটা মানে না, তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(বাক্বারাহ ২/১২১)*।

কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, তারাই লাঞ্ছিত হবে' *(মুজাদালা ২০)*। আল্লাহ তাঁর কিতাবে আরও বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র কথা মান, রাসূলের অনুসরণ কর' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*। আল্লাহ তা'আলার কিতাবেই নির্দেশ রয়েছে রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণ করার এবং তাঁর কথা মানার। তাই মুসলমানকে অবশ্যই কুরআন এবং হাদীছের বিধান পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। এই মেনে চলাকেই বলে ধর্ম পালন। মানুষের জন্যই ধর্মবিধি। ধর্মবিধির জন্য মানুষ নয়।

বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে একদল মানুষ রয়েছে, তারা মুসলমান বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, অথচ তাদের মধ্যে মুসলমানিত্ব অনুপস্থিত। তাদের কাজে, কথায় প্রকাশ পায় ইসলামের বৈরিতা। এমনই এক নাদান বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি কলামে লেখা হয়েছে, দেশের চোর, ডাকাত, খুনী, স্মাগলাররা, দেশের সন্ত্রাসীরা তাদের দিন শুরু করে আল্লাহ দিয়ে। ইনশাআল্লাহ, মাশাল্লাহ সোবহানাল্লাহ্র ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা, আর যাইহোক মানুষের কোন উপকার হয় না। নাদানেরা কখনো আল্লাহ্র নাম স্মরণের মর্তবা এবং উপকারিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। আর এ জন্যই তো তারা নাদান। এরা দিন রাত অশালীন অভিনয়, গান-বাজনা, নৃত্য, বাজে আলাপেই মত্ত থাকে। তাই তারাই সর্বক্ষণ টেলিভিশনের পর্দায় স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখে, রাত জেগে মোবাইল ফোনে চ্যাটিং করে কাটায়। এর ফায়দাটা যে কী, তা দ্বীনদার ঈমানদার মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে শুধু রঙ-তামাসা করার জন্য সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর সেকারণেই আল্লাহ্র নাম সর্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন। তবু মানুষ গাফেল হয় এবং সর্বনাশের সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য, মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্র কিতাবে এবং নবী (ছাঃ)-এর হাদীছে বহু নির্দেশনা এসেছে।

অতএব আসুন! আমরা উপরে বর্ণিত সর্বনাশের সিঁড়ি থেকে পরহেয করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন! আমীন!!

সাময়িক প্রসঙ্গ

হিমালয়কেন্দ্রিক বাঁধ : বাংলাদেশে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা

-মুনশী আব্দুল মান্নান

হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলোর ওপর ৫৫২টি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে এসব বাঁধ নির্মাণ করছে প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তান। পত্রিকান্তরে এ খবর প্রকাশের পর বিভিন্ন মহলে ব্যাপক উদ্বেগ ও বিচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ঐ চার দেশের এ বিশাল উদ্যোগ-পদক্ষেপ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না বাংলাদেশ সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও। হিমালয়কেন্দ্রিক বহু নদীর অচ্ছেদ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের অবস্থান সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় এসব নদীর পানি বাংলাদেশের ওপর দিয়েই সমুদ্রে পতিত হয়। আন্তর্জাতিক আইন-বিধি অনুযায়ী, ভাটির দেশকে অবহিত না করে কিংবা তার সম্মতি না দিয়ে উজানের কোন দেশের অভিন্ন নদীতে বাঁধ বা প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে পানিপ্রবাহ ব্যাহত করার এখতিয়ার নেই। বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর উৎপত্তিস্থল সীমান্তের বাইরে। এর মধ্যে ৫৪টি উৎপন্ন হয়েছে হিমালয় পর্বত শ্রেণী ও অন্যান্য স্থান থেকে। হিমালয়বাহিত নদীগুলো নেপাল, ভুটান ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাকি তিনটি নদীর উৎপত্তিস্থল মায়ানমার। লক্ষ্যণীয় যে, ভারত, নেপাল ও ভুটান হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগ-পদক্ষেপ ও তৎপরতা শুরু করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের ন্যূনতম গরজ অনুভব করেনি। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, বাঁধ নির্মাণের এ বিশাল কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দুঃখজনক ব্যর্থতার পরিচয় এই যে, এ দু'টি মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে সম্ভবত কোন খবরই রাখে না। পানি নিয়ে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হ'লেও ভারত যেমন এ বিষয়ে কিছু বলেনি, বাংলাদেশও তেমনি নীরবতা অবলম্বন করে গেছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, পররাষ্ট্র ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে হয় কিছুই জানে না অথবা কিছু জানলেও বিষয় হিসাবে তা আলোচনাযোগ্য বলে মনে করেনি।

ভারত একদিকে বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ, অন্যদিকে দিনকে দিন তার বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়ছে। এ কারণে সে নিজে যেমন পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় আকারের পরিকল্পনা নিয়েছে তেমনি নেপাল ও ভুটানে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। নেপাল ও ভুটান খুশি এই ভেবে যে, ভারতে বিদ্যুৎ রফতানি করে প্রতিবছর তারা মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ইতিমধ্যে ভুটানের রাজস্ব আয়ের একটা প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে পানি বিদ্যুৎ। ২০০৬ সালে ভারত ভুটানের সঙ্গে ৬০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ভারত ভুটান থেকে ৫ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করবে। পর্যায়ক্রমে এ আমদানি উন্নীত হবে ১০ হাযার মেগাওয়াটে। নেপালও তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ২২ হাযার মেগাওয়াট পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের পুরোটাই রফতানি হবে ভারতে। বলাবাহুল্য, বিদ্যুৎ সংকট বাংলাদেশও প্রকট। আগামীতে বিদ্যুৎ চাহিদা আরও বাড়বে। হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত, নেপাল ও ভুটানের উদ্যোগ-পরিকল্পনার সঙ্গে বাংলাদেশকে যদি সংযুক্ত করা হ'ত অর্থাৎ পরিকল্পনা যদি চতুর্দেশীয় হ'ত তাহ'লে উৎপাদিত বিদ্যুতের একটা অংশ বাংলাদেশও পেতে পারতো। বাংলাদেশকে সূক্ষ্ম কৌশলে এ উদ্যোগ-পরিকল্পনার বাইরে রাখা হয়েছে। ভারত হিমালয় কেন্দ্রিক নদীগুলোর ভারতীয় অংশে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে চুক্তি করে আগামীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর বন্দোবস্ত বেশ ভালভাবেই করছে। অথচ এসব প্রকল্পের কারণে যে দেশটি সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে সেই বাংলাদেশকে বিন্দুমাত্র আমলে নেয়ার তাকীদ বোধ করছে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, পানি ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন আঞ্চলিক ভিত্তিতে হ'লে প্রতিটি দেশই কিছু কম বা বেশী লাভবান হ'তে পারতো। এক্ষেত্রে কারো একতরফাভাবে লাভবান এবং কারো একতরফাভাবে বঞ্চিত হওয়ার অবকাশ থাকতো না।

হিমালয় থেকে উৎসারিত নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাপত্রের আলোকে আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে, ভারত, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানে এ মুহূর্তে ১শ'টি পানি প্রকল্পের কাজ চলছে। এসব প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ২৩ হাযার ৩১৮ মেগাওয়াট। নির্মাণাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ৪৬টি। এসব প্রকল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯ হাযার ২৫৪ মেগাওয়াট। পরিকল্পনাধীন আছে ৪০৬টি প্রকল্প, যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১ লাখ ৬৯ হাযার ৪০১ মেগাওয়াট। সর্বমোট ৫২২টি বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ২ লাখ ১২ হাযার ২৭৩ মেগাওয়াট।

এসব প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সকল দেশই বিদ্যুৎ পাবে,

কেবল পাবে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত কোন নদ-নদীর উৎসস্থলই পাকিস্তান নয়। ফলে পাকিস্তান যেসব নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করছে বা করবে, তার প্রতিক্রিয়া সরাসরি বাংলাদেশে পতিত হওয়ার কথা নয়। ভারত, নেপাল ও ভুটানের নদীগুলোর সঙ্গেই বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। এই তিন দেশে যেসব প্রকল্প গৃহীত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তার অনিবার্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে পড়বেই।

উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। যে উদ্দেশ্য নিয়েই হোক, নদীতে বাঁধ বা প্রতিবন্ধক নির্মাণ করলে ভাটির দেশ বা অঞ্চলে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাবেই। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। অভিন্ন নদী গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের পদ্মা এখন মরা খালে পরিণত হয়েছে। পদ্মার শাখা-প্রশাখার অবস্থা আরও শোচনীয়। শুকনো মৌসুমে অনেক নদীতেই পানি থাকে না। এসব নদীর প্রবাহ স্বল্পতা বা প্রবাহশূন্যতার বহুমাত্রিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। দ্রুতই নদীগুলো ভরাট হয়ে পড়ছে। উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মরুময়তা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তার ঘটছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হচ্ছে। সেচে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পানিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির অভাবে বন ও গাছপালার বিকাশ-বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। মিঠা পানির সঙ্কটে শিল্প-উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় বিনাশ সাধিত হচ্ছে। এছাড়া আরও নানাবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জীবন ও জীবিকায়।

গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি পাচ্ছে না। গঙ্গায় পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় ফারাক্কা পয়েন্টে যে পানি আসছে তা খুবই অপ্রতুল। ভারত তিস্তার উজানে গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে শুকনো মৌসুমে তিস্তার পানি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। দেশের বৃহত্তম তিস্তা সেচ প্রকল্পের অস্তিত্ব পানির অভাবে হুমকির মুখে। তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে একটি ফায়ছালায় বা চুক্তিতে আসার কথা বহুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে। আজও পর্যন্ত সেই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়নি।

উজানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ নির্মাণের কথিত কর্মযজ্ঞ শেষ হ'লে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি হবে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তার সারকথা হ'ল: পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। নদ-নদীর পানিপ্রবাহ আরো কমে যাবে এবং এক সময় এগুলো মারা যাবে। নদ-নদীর পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় দ্রুত লবণাক্ততার বিস্তার ঘটবে। পানিশূন্যতায় মরুময়তাও দ্রুতায়িত হবে। ধ্বংস হয়ে যাব 'বাংলাদেশে ঢাল' সুন্দরবন। ফসল জন্মানো কঠিন হয়ে পড়বে। সড়কসেতু, ভবন ও স্থাপনাগুলো মরীচা বা নোনা ধরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। বর্ষায় বন্যা ও ভাঙ্গনের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। জীবিকা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই সঙ্গে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের স্থানচ্যুতি ঘটবে ইত্যাদি।

যার এ রকম সর্বনাশের আশঙ্কা, সেই বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে নদ-নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই পরিকল্পনা ও তৎপরতা কতটা উদ্বেগজনক, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আরও উল্লেখের বিষয়, বাংলাদেশ এখনো এ ব্যাপারে প্রায় অন্ধকারেই রয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলো হঠাৎ করেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এটা মনে করার কোনই কারণ নেই। বহুদিন ধরেই এ তৎপরতা চলছে। বাংলাদেশের তা না জানার ব্যর্থতার মত বড় ব্যর্থতা আর কিছুই হ'তে পারে না।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কালবিলম্ব না করে সরকারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিতে হবে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ব্যাপক মূল্যায়ন ও সমীক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব তা নির্ণয় করতে হবে এবং নির্ণীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। আলোচ্য খবরে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে জাতিসংঘের ওয়াটার কোর্স কনভেনশন এখনও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ কনভেনশনের পক্ষে ভোট দিলেও এখনও তা অনুস্বাক্ষর করেনি এবং সংসদে রেটিফাই করেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গিয়ে তার বক্তব্য ও দাবি জানাতে পারতো যদি ঐ কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরসহ সংসদে তা রেটিফাই হ'ত। এতদিনেও কেন এদিকে নযর দেয়া হয়নি এটা একটা বড় প্রশ্ন। যা হোক, এখন সময়ক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই। আমরা আশা করতে চাই, সরকার বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আমলে নেবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ অঞ্চলের পানি সঙ্কট দূর এবং পানির বহুমুখী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। বিশেজ্ঞরা বহুদিন ধরে এ বিষয়ে তাকীদ দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাস্তবে কোন উদ্যোগ এখনও গৃহীত হয়নি। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের বিশেষজ্ঞরা পুনরায় আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপর

গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা পানি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। বাংলাদেশ বহু আগে থেকেই পানি সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক উদ্যোগ-ব্যবস্থার কথা বলে আসছে। বাংলাদেশই প্রথম নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করে ত্রিদেশীয় উদ্যোগে নেপালে রিজার্ভার নির্মাণ এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারত রাজি না হওয়ায় যৌথ নদী কমিশনে নেপালের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি ভারত নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের প্রস্তাব মাফিক নেপালে রিজার্ভার নির্মাণ করা হ'লে, বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী অন্তত ১শ' বছর এসব দেশে পানির কোন সঙ্কট হবে না। অন্যদিকে রিজার্ভারকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হ'লে হাযার হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব হবে যা প্রতিটি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বড় আকারে অবদান রাখতে পারবে। এ প্রসঙ্গে এই মর্মে একটি খবর পাওয়া গেছে যে, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল গঙ্গা অববাহিকাভিত্তিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে যার লক্ষ্য পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানি সংরক্ষণ। প্রকল্পটি নেয়া হ'লে বলতে হবে, বাংলাদেশের প্রস্তাবটিই এতদিনে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তিনটি প্রধান অববাহিকা এবং অন্যান্য অভিন্ন নদী দিয়ে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে যে পরিমাণ পানি সমুদ্রে পতিত হয়, বিশেষজ্ঞদের মতে, তা ধরে রাখলে বাংলাদেশ অন্তত ৩৫ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত হয়ে থাকতো। এ থেকে বুঝা যায়, পানির কোন সঙ্কট এ অঞ্চলে নেই। সঙ্কট যেটা আছে সেটা হ'ল, পানি ব্যবস্থাপনার বা পানির ব্যবহার পরিকল্পনার। আঞ্চলিক উদ্যোগে এ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হ'লে পানি নিয়ে কোন ভাবনায় পড়তে হবে না এ অঞ্চলের দেশ ও মানুষের। আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ-পদক্ষেপের সঙ্গে চীনকে যুক্ত করার কথাও বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন। ব্রহ্মপুত্র এ অঞ্চলের দীর্ঘতম নদ। এর অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হ'লে চীনের সংযুক্তি অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞরা আরও একটি কথা বরাবরই বলে আসছেন যে, আঞ্চলিক ও অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যার অভাব রয়েছে। কোন কোন দেশ এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক নয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সকল দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঐকমত্য না হ'লে আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে, বাস্তবে রূপ নেবে না। এ ব্যাপারে আমরা প্রতিটি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সদিচ্ছাপ্রবণ হওয়ার আহ্বান জানাই।

॥ সংকলিত ॥

হাদীছের গল্প

(১) এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কাউকে রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন দিয়ে। আবার কাউকে সম্পদের প্রাচুর্য, বিলাস বহুল জীবন ও সুখ-সমৃদ্ধি দান করে। সেকারণ মানুষের উচিত বিপদাপদে আল্লাহ্র নিকটেই পরিত্রাণ প্রার্থনা করা এবং সুখে-শান্তিতেও মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'যদি তোমরা আমার নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অধিক পরিমাণে প্রদান করব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহ'লে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন' *(ইবরাহীম ৭)*। সুতরাং মানুষকে পূর্বের অবস্থা স্মরণ রেখে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। অন্যথা অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে দুনিয়াতেই আল্লাহ শাস্তি দিতে পারেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছি প্রণিধানযোগ্য :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈলের মাঝে তিনজন ব্যক্তি ছিল; কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। অতঃপর কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে তিনি বললেন, তোমার সবচেয়ে পসন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, সুন্দর চামড়া এবং সেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, লোকেরা যার কারণে আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীর মুছে দিলেন। এতে তার রোগ দূর হ'ল এবং তাকে সুন্দর বর্ণ দান করা হ'ল। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয়? সে বলল, উট অথবা গরু (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তাকে তখন দশ মাসের গর্ভবতী একটি উটনী দেয়া হ'ল। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দিন। তারপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার সবচেয়ে পসন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক হ'তে মুক্তি, লোকেরা যার কারণে আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথা মুছে দিলেন। এতে তার টাক ভাল হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হ'ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হ'ল। তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, তোমার অধিক পসন্দের জিনিস কি? সে বলল, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন, আমি যাতে মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে তার চোখের দৃষ্টি আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন ছাগী দেয়া হ'ল, যা অধিক সংখ্যক বাচ্চা দেয়। তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা হ'ল এবং উট দিয়ে একটি ময়দান, গরু দিয়ে আরেকটি ময়দান এবং ছাগল দিয়ে অন্য একটি ময়দান ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি, তারপর তোমার সহায়তায়। যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দর বর্ণ, সুন্দর ত্বক ও সম্পদ দিয়েছেন, সে আল্লাহ্র নামে তোমার নিকট আমি একটা উট চাচ্ছি, যার সাহায্যে আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। সে বলল, (আমার উপর) অনেকের অধিকার রয়েছে। তিনি বললেন, তোমাকে বোধহয় আমি চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? লোকেরা তোমাকে কি ঘৃণা করত না? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, এই সম্পদ তো আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তাহ'লে তোমাকে যেন আল্লাহ আগের মতো করে দেন।

এরপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে অনুরূপ বললেন, প্রথম লোকটিকে যা বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বের লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহ'লে আল্লাহ যেন তোমাকে পুনরায় আগের মতো করে দেন। এরপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে তাঁর আগের রূপ ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্যে পৌঁছতে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপায় নেই, তারপর তোমার সহায়তায়। সেই আল্লাহ্র নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তোমার যত ইচ্ছা মাল তুমি নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্র শপথ! মহান আল্লাহ্র ওয়াস্তে আজ তুমি যা কিছু নিবে তাতে আমি তোমাকে বাঁধা প্রদান করব না। ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তোমাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন *(বুখারী হা/৩৪৬৪; মুসলিম হা/২৯৬৪)*। আল্লাহ যে মানুষকে পরীক্ষা করেন উপরোক্ত হাদীছ তার বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং দুনিয়ার মোহমায়ায় ও এর প্রাচুর্যে আবিষ্ট হয়ে আল্লাহ্র নে'মতকে ভুলে না গিয়ে, আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করাই যথার্থ মুমিনের পরিচয়।

(২) পৃথিবীতে মানুষ পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। মা দশ মাস অবধি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেন এবং অসীম ধৈর্য ধারণ করে তাকে লালন-পালন করেন। তাই মায়ের মর্যাদা অত্যধিক।

সন্তানের জন্য মায়ের দো'আ আলাহ সাথে সাথে কবুল করেন। এজন্য মায়ের আদেশ-নিষেধের প্রতি সকল সন্ত ানকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্যথা মায়ের বদ দো'আর ফলে সন্তান বিপদাপদের সম্মুখীন হ'তে পারে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (বানী ইসরাঈলের) তিন জন ব্যতীত আর কেউই দোলনায় কথা বলেননি। (ক) ঈসা ইবনু মারিয়াম এবং (খ) ছাহেবে জুরায়জ। জুরায়জ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। নিজের জন্য একটি ইবাদতখানা তৈরী করে তিনি সেখানেই বসবাস করছিলেন। তার মা সেখানে আসলেন। তিনি এই সময় ছালাত পড়ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে রব! আমার ছালাত ও আমার মা। জুরায়জ ছালাতেই মগ্ন থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। তার মা পরের দিন আসলেন। তিনি এবারও ছালাতে রত ছিলেন। তাকে তার মা ডাকলেন, হে জুরায়জ! তিনি (মনে মনে) বললেন, হে রব! আমার মা ও আমার ছালাত। তিনি ছালাতেই মগ্ন থাকলেন। পরের দিন এসেও মা তাকে ছালাতে মগ্ন দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরায়জ! জুরায়জ বলেন, হে আল্লাহ! আমার মা ও আমার ছালাত। তিনি তার ছালাতেই রত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! তুমি একে ব্যভিচারী নারীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না। বানী ইসরাঈলের মাঝে জুরায়জ ও তার ইবাদতের চর্চা হ'তে লাগল। এক যিনাকারী নারী ছিল। সে উলেখযোগ্য রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, যদি তোমরা বল তবে তাকে (জুরায়জকে) আমি বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে বিরক্ত করতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তিনি (জুরায়জ) লক্ষ্যই করলেন না। তারপর মহিলাটি তার ইবাদতখানার নিকটবর্তী এলাকায় এক রাখালের নিকট আসল। নিজের উপর তাকে সে অধিকার দিল এবং উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'ল। এতে করে সে গর্ভধারণ করল। সে সন্তান জন্ম দিয়ে বলল, এটা জুরায়জের সন্তান। বানী ইসরাঈলরা (রাগান্বিত হয়ে) জুরায়জের নিকট এসে তাকে ইবাদতখানা থেকে বাইরে নিয়ে আসল, ইবাদতখানাটি ধ্বংস করে দিল এবং তাকে মারধর করতে লাগল। জুরায়জ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, এই নারীর সাথে তুমি ব্যভিচার করেছ। ফলে একটি শিশু জন্ম নিয়েছে। তিনি বললেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটিকে নিয়ে আসল। জুরায়জ বললেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, ছালাত পড়ে নেই। অতঃপর তিনি ছালাত পড়লেন। ছালাত শেষে তিনি শিশুটির নিকট এসে তার পেটে খোঁচা মেরে প্রশ্ন করলেন, হে শিশু! তোমার জন্মদাতা কে? সে বলল, অমুক রাখাল আমার পিতা। তখন উপস্থিত ব্যক্তিরা জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হ'ল এবং তাকে চুমু দিতে লাগল। তারা বলল, আমরা এখন তোমার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন, প্রয়োজন নেই, বরং আগের মতো মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। তারপর তার ইবাদতখানাটি তারা আবার নির্মাণ করে দিল।

(গ) একটি বাচ্চা তার মায়ের দুধ পান করছিল। একটি লোক এমন সময় সেখান দিয়ে দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি জন্তুযানে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল উন্নত মানের। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এই লোকের ন্যায় উপযুক্ত করো। দুধপান ছেড়ে দিয়ে শিশুটি লোকটির দিকে তাকাল, তারপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এই লোকের মতো করো না? এই বলে সে পুনরায় দুধ পান করতে থাকল। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি যেন এখনও দেখছি, শিশুটির দুধ পানের চিত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনী (শাহাদাৎ অঙ্গুলি) মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) বললেন, একটি দাসীকে মারতে মারতে লোকেরা নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, তুমি ব্যভিচার করেছ এবং চুরি করেছ। মহিলাটি বলছিল, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং আমার জন্য তিনিই উত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে তুমি এই ব্যভিচারিণী মহিলার মতো করো না, দুধপান ছেড়ে দিয়ে শিশুটি মহিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করল, তারপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এই মহিলার মতো করে গড়ে তুলো। মা ও শিশুর মাঝে এ সময় কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেলো। মা বলল, একজন সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাবার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে এমন উপযুক্ত করে দাও। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরকম করো না। আবার এই দাসীকে লোকেরা যখন মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি ব্যভিচার করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এর মতো করো না। আর তুমি প্রতিউত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন করো। শিশুটি এবার উত্তর দিল, প্রথম লোকটি ছিল স্বৈরাচারী অত্যাচারী। আমি সেজন্যই বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এই লোকের মতো করো না। আর এই নারীকে তারা বলে, তুমি যিনা করেছ। সে প্রকৃতপক্ষে যিনা করেনি। তারা বলে, তুমি চুরি করেছ, প্রকৃতপক্ষে সে চুরি করেনি। এ কারণেই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এ মহিলাটির মতো করো *(বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০)*।

পরিশেষে বলব, অত্যাচারী স্বৈরাচারীকে কেউ পসন্দ করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহভীরু নির্দোষ মানুষকে সকলেই পসন্দ করে। যেরূপ মাতৃক্রোড়ে দুধপানরত শিশুটি বিনাদোষে নির্যাতিত মহিলাটির মতো হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করেছিল। আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পাষাণ হৃদয়

পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে অধিকাংশ মানুষই নিজের স্বার্থ ও লাভ-লোকসানের চিন্তা করে। এ লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে গিয়ে কখনও সে নিজের স্বজনকে ত্যাগ করে কিংবা আপনজনকে হত্যাও করে ফেলে। স্বার্থান্ধ মানুষ কেবল নিজের দিকটাকে বড় করে দেখে; অপরের বিষয়টা ভাবে না। অথচ মানুষ হিসাবে একে অন্যের জন্য কাজ করার কথা, পরস্পরের জন্য ত্যাগ করার কথা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও পরোপকারে আত্মনিয়োগ করার কথা। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষের কাছে এসব কেবল নীতিবাক্য। এসব বলার কথা, শোনার কথা, মানার জন্য নয়। মানুষ এগুলি আমল করলে এ সমাজ সুন্দর সমাজে পরিণত হ'ত। অথচ স্বার্থপরতা মানুষকে পাষাণ হৃদয় করে ফেলে। মানুষের স্বাভাবিক মানবতা তার মধ্যে থাকে না। শত প্রচেষ্টায়ও তার হৃদয়ের কঠিন পাথরকে নরম করা যায় না; তার মন গলানো যায় না। এখানে পাষাণ হৃদয় সম্পর্কে একটি গল্প বলতে চাই।

সুমি ধনাঢ্য পিতার আদরের দুলালী। কি নেই তার? যেমন চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য। শিক্ষা-দীক্ষায়, চাল-চলনে চরিত্র-মাধুর্যে আর দশটা মেয়ের চেয়ে সে ভিন্ন। উচ্চ শিক্ষার অহংকার তার মাঝে নেই, পিতার অঢেল সম্পদের গর্বও তাকে কখনও কেউ করতে দেখেনি। ব্যস্ততম শহরের আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেড়ে উঠেছে সে; কিন্তু তার মাঝে কোন উচ্ছৃংখলতা নেই, নেই বেলেল্লাপনা। এক কথায় কমনীয় চেহারার অতুলনীয় ভদ্র-শালীন মেয়ে সুমি। যে কেউ দেখলে তাকে একবাক্যে পসন্দ করবে। অথচ তার এই গুণাবলী সকলের মন জয় করতে পারলেও তার স্বামীকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পিতা অনেক আশা করে চোখের পুঁতলি, নয়নের মণি মেয়েকে কাছে রাখবেন বলে বাড়ীর পাশে বিবাহ দেন। মেয়ের সাথে তার পরিবারে প্রয়োজনী সবই তিনি দেন। কনের গাড়ীর সাথে ট্রাক ভর্তি করে সব জিনিস যায় বরের বাড়ী। বর-কনের রুম সজ্জিত হয় কনের পিতার দেওয়া খাট, সোফা, আলমারী সহ অন্যান্য আসবাব পত্রে। পিতার দেওয়া উপহার সামগ্রীতে বরের বাড়ী সজ্জিত হ'লেও সুমির নিজের জীবনটা সাজানো হ'ল না। সে জীবনটাকে রাঙাতে পারল না নিজের মত করে। আলাপ-পরিচয়ের পূর্বেই অর্থাৎ বিয়ের পরের দিনই সুমির স্বামী প্রবাসী হয় ইউরো-ডলারের লোভে। প্রাণপ্রিয় স্বামী প্রবাসী হওয়ার পর এক যুগ কেটে গেছে, সুমির খবর সে নেয়নি। সুমি কেবল স্বামীর ভালবাসা লাভের মানসে ৪টি বছর শয্যাশায়ী শ্বশুরের অকৃত্রিম সেবা-শুশ্রূষা করে। এক যুগ ধরে স্বামীর অপেক্ষায় থাকে সে। হয়তো স্বামী একদিন এসে তাকে আদরে-সোহাগে নিজের করে নেবে। কিন্তু তার সে স্বপ্ন পূরণ হয় না, তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এক সময় জানিয়ে দেয় যে, আমাকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার কোন আশা বা চেষ্টা কোনটাই তুমি কর না। একথা শুনে সুমি যেন আকাশ থেকে পড়লো। চোখের জলে বুক ভাসাল সে। পানাহার ছেড়ে দিল। স্বামীর এহেন আচরণের কথা সে ভুলতে পারে না। তার কানে ঐ কথাটিই যেন বার বার অনুরণিত হয়। এটাকে সে দূর করতে পারে না। এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায় না। অবশেষে সে এ দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্তির জন্য বেছে নেয় সিডাক্সিন (ঘুমের বড়ি)। সারা দিন ঘুমের বড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, ঐ কথা আবার তার মনে পড়ে যায়, তখন সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের অন্যদের সতর্ক দৃষ্টির কারণে সেটাও হয়ে ওঠে না। এরই মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন পিতা মারা যান, এর অব্যবহিত পরে মারা যান বড় ভাইও। এমনি এক দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকে সুমি। জীবন তার কাছে হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ। কিন্তু কি করবে সে?

পরিবারের অন্যরা তাকে চেষ্টা করে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার কিন্তু সে রাযী হয় না। সে বিশ্বাস করতে পারে না অন্য কোন পুরুষকে। সে ভাবে আমার স্বামী যদি আমাকে গ্রহণ নাই করবে, তাহ'লে কেন সে এ বিয়েতে রাযী হ'ল। তার মত হয়তো সব পুরুষ হৃদয়হীন নিরেট পাথরে গড়া। তাই সে বিশ্বাস করতে পারে না যে, অন্য কেউ তাকে ভালভাবে গ্রহণ করবে। পরিবারের কথামত অন্যত্র বিবাহ না করায় ভাই-বোনেরা, এমনকি গর্ভধারিনী মায়েরও সে চক্ষুশুলে পরিণত হয়েছে। তাই এ জীবনের ভার বহন করা আজ তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সুমি জানে না কি তার দোষ? তার এই সুন্দর জীবনটা নষ্টের জন্য কে দায়ী, তার পরিবার, নাকি স্বামী নামের ঐ মানুষটি? নারীর অতি সাধের ঘর সুমির বাঁধা হ'ল না, এর জন্য কি সমাজ দায়ী নয়? এর জন্য কি শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী নয়?

অতএব আমাদেরকে এই সমাজ পরিবর্তনে, শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে। যাতে কোন নিরীহ মানুষ নির্যাতিত না হয়, কোন প্রাপক বঞ্চিত না হয়, কোন মানুষ অধিকার হারা না হয়, কারো সুন্দর জীবন বিনষ্ট না হয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর সমাজ রেখে যাওয়ার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

** শামীমা ফেরদৌসী*
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

ক্ষেত-খামার

দোতলা কৃষি পদ্ধতি

কৃষিক্ষেত্রে বাড়তি ফসলে বিপ্লব আনতে পারে 'দোতলা কৃষি'। এই কৃষি চাষাবাদ বিষয়ে গ্রামবাংলার কৃষকের মধ্যে ধারণা রয়েছে অনেক আগে থেকেই। কৃষক একই জমিতে নিচে এক ফসল আর মাচা করে জানালায় আর এক ফসল, বসতবাটির চালে, গাছে লাউ, শসা, বটবটি, সিম, পুঁইশাক আবাদ করার সাথে পরিচিত। এই পরিচিত চাষাবাদে বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাত্রা যোগ করেছেন পাবনার আটঘরিয়া কলেজের কৃষি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কৃষিবিদ মুহাম্মাদ জাফর সাদেক এবং তার সহোদর জ্যোতির্বিদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাদেক। ভ্রাতৃদ্বয় দেশের ক্রমহ্রাসমান আবাদী জমি এবং ক্রম বৃদ্ধিমান জনসংখ্যা নিয়ে খাদ্য-ফসল ঘাটতি পূরণের চিন্তা করেন। সেই চিন্তা থেকেই তারা বাড়তি ফসলের জন্য গবেষণা শুরু করেন। সূর্যালোক বিবেচনায় এনে কৃষি ও জ্যোতির্বিদ্যার সফল প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার বিপরীতে 'দোতলা কৃষি' পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ'র মাধ্যমে নিজ খাদ্য উৎপাদন করতে সূর্যের আলো প্রয়োজন হয়। কৃষিতত্ত্ব মতে ৮ ঘণ্টা সূর্যালোকই উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। কৃষিতাত্ত্বিক এই ধারণা নিয়ে জমির মূল ফসলের (বেসক্রপ)'র উপর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ভূমি হ'তে ৫ ফুট উঁচুতে এবং ৪ ফুট চওড়া ও ১৩ ফুট পরপর মাচা নির্মাণ করলে জমিতে অনধিক আড়াই ফুট উচ্চতার একটি ফসল এবং মাচায় লতা জাতীয় অন্য ফসল আবাদ করা সম্ভব। এ আবাদে বেসক্রপের কোন ক্ষতি হয় না। সূর্যের আলোর প্রতিবন্ধকতা হয় না। বরং বেসক্রপের সাথে বাড়তি ফসল উৎপাদন করে ফসল ঘাটতি কমিয়ে আনা শুধু নয়, এতে বাড়তি আয় হবে বছরে ২০ হাযার কোটি টাকা বা ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষিবিদ মুহাম্মাদ জাফর সাদেক ২০০৮-০৯ সালে নওগাঁ যেলার মহাদেবপুর-বদলগাছি আসনের সংসদ সদস্য ড. আকরাম এইচ চৌধুরী পৃষ্ঠপোষকতায় নওগাঁ যেলার ধান উৎপাদনশীল জমিতে দোতলা কৃষির এই গবেষণা শুরু করেন। ঐ যেলার বদলগাছি ইউনিয়নের ডাঙ্গিসারা গ্রামের দীনের সিং এর ৭ কাঠা জমিতে মাচায় লাউ, মাটিতে বি-আর-২৮ জাতের ধান আবাদ করা হয়। সাত কাঠা জমিতে ধানের ফলন পাওয়া যায় ৮ মণ যা বিঘার হিসাবে ২৩ মণ (বাম্পার ফলন এবং জাতীয় গড় ফলনের সমান) আর এই ৭ কাঠা গবেষণালব্দ জমিতে কভারক্রপ হিসাবে মাচায় ২১৫টি লাউ উৎপাদিত হয়।

মৌমাছি পালন পদ্ধতি

অন্যান্য প্রাণীকে যেমন নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, মৌমাছির বেলায় তার কোন প্রয়োজন নেই। মৌমাছি নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। এদের খাদ্য ফুলির পরাগ রেণু এবং পুষ্পরস থেকে মধু উৎপাদন করে তা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। তাছাড়া নিজ দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করে মোম, যার দ্বারা চাক বা কুঠরি বানায়। এ কুঠরিগুলোতে মৌমাছির ডিম, শুককীট, মুককীট ইত্যাদি থাকে এবং সঞ্চিত মধু ও পরাগরেণু সংরক্ষণ করা হয়। প্রকৃতিতে যখন ফুলের সমারোহ কম থাকে কিংবা ঝড়-বৃষ্টি ও শীতের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, সে সময় কলোনিতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় চিনি এবং পানি ১ঃ১ অনুপাতে মিশ্রিত করে মৌমাছিকে খাওয়াতে হয়। মৌচাকে মধু জমা করার পর তা মোম দ্বারা ঢেকে ফেলে। যখন চাকের অধিকাংশ কোষ মধুতে পূর্ণ হয় সে সময় মধু নিস্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে সাবধানে তা বের করে আনতে হয়।

পরিচর্যা : সাফল্যের সঙ্গে মৌমাছি পালন করতে হলে নির্ধারিত সময় পরপর মৌ-কলোনির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা, পর্যবেক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঋতুভেদে এ পরিচর্যা ৭-১০ দিন পরপর করতে হয়। মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক শ্রম দেয়ার প্রয়োজন নেই। সপ্তাহে একবার একটি মৌ-কলোনির জন্য মাত্র ৮-১০ মিনিট সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট। এ জন্য অন্য পেশার পাশাপাশি তা করা সম্ভব।

উপযুক্ত পরিবেশ : মৌ-বাক্স রাখার জন্য নির্ধারিত স্থানটি ছায়াযুক্ত, শুকনা ও আশপাশে মৌমাছির খাদ্য সরবরাহের উপযোগী গাছ-গাছড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে কিছু কিছু ঋতুভিত্তিক গাছ যরূরী ভিত্তিতে লাগানো যেতে পারে। নির্বাচিত স্থানের আশপাশে যেন বিকট শব্দ সৃষ্টিকারী এবং ধোঁয়া উৎপাদনকারী কোন কিছু না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মৌমাছির শত্রু ও রোগ : মৌমাছির প্রধান শত্রু মথ পোকা। এছাড়া পিঁপড়া, তেলাপোকা, বোলতা, টিকটিকি, ইঁদুর, পাখি, ফড়িং, শিয়াল, কুনোব্যাঙ ইত্যাদির হাত থেকে মৌমাছিকে রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উপরন্তু জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতো মৌমাছিও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে এবং এর ফলে মৌমাছির মৃত্যু হ'তে পারে। শুকটীক এবং মুককীট অবস্থায় মৌমাছি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি একারাইন, আমাশয়, ফাউলব্রুড. অবশতা ও ফাঙ্গাস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এসব রোগের নিরাময়কল্পে নির্ধারিত ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

মৌমাছি পালন প্রকল্প স্থাপনের জন্য আলাদাভাবে কোন জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর আনাচে-কানাচে, ঘরের বারান্দায়, ছাদে কিংবা বাগানেও মৌ-বাক্স রাখা যায়। অ্যাপিস সেরানা প্রজাতির ৫টি মৌ কলোনি সম্বলিত মৌ-খামার স্থাপনের জন্য মোট বিনিয়োগ হবে ১৫-১৬ হাযার টাকা। প্রতিবছর গড়ে প্রতি বাক্স থেকে ১০ কেজি মধু পাওয়া যাবে, যার বাজার মূল্য ২৫০/= টাকা হিসাবে ২৫০০/= টাকা। এ হিসাবে ৫টি বাক্স থেকে উৎপাদিত মধুর মূল্য দাঁড়াবে ৫×১০ কেজি×২৫০ টাকা (প্রতি কেজি)= ১২,৫০০/= টাকা। এই আয় ১০-১৫ বছর অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ প্রথমে মাত্র একবার ১৫-১৬ হাযার টাকা ব্যয় করে প্রকল্প স্থাপন করলে মৌ বাক্স এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ১০-১৫ বছর ব্যবহার করা যাবে। আর কোন বিনিয়োগ বা খরচ নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে অ্যাপিস মেলিফেরা প্রজাতির ৫টি মৌ-কলোনি সম্বলিত মৌ-খামার স্থাপনের জন্য মোট ব্যয় হবে ২৫ থেকে ২৭ হাযার টাকা। এক্ষেত্রেও ১০-১৫ বছর পর্যন্ত মৌ-বাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যাবে। আর কোনো অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে না। মেলিফেরা প্রজাতির প্রতিটি মৌ-বাক্স থেকে বছরে ৫০ কেজি পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করা সম্ভব, যার বাজার মূল্য ৫০ কেজি×২৫০ টাকা (প্রতিকেজি)×৫টি বাক্স= ৬২,৫০০ টাকা। প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মাত্র ২৫-২৭ হাযার টাকা এককালীন বিনিয়োগ করে প্রতিবছর ৬০ হাযার টাকার ঊর্ধ্বে আয় করা সম্ভব। মৌ-বাক্সের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধির মাধ্যমে এ আয় অনেকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। স্বল্প পরিশ্রমে এ ধরনের প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়, তেমনি পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা দানের মাধ্যমে দেশের ফল ও ফসলের উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দান করা যায়।

কবিতা

একুশের চেতনা

-শহীদুল ইসলাম
ভাটপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর।

একুশ তুমি
ভাষার প্রতীক জীবনজয়ের গান।
একুশ তুমি
স্বজনহারা লাখো মানুষের প্রাণ।
একুশ তুমি
বাঙ্গালী জাতির ভাষার অধিকার।
একুশ তুমি
বাংলামায়ের বুকের অহংকার।
একুশ তুমি
লাখো বাঙ্গালীর দীপ্ত অঙ্গীকার।
একুশ তুমি
মুক্তিসেনার প্রবল হাতিয়ার
একুশ তুমি
দুঃখী মানুষের শীর্ষ মর্মব্যথা।
একুশ তুমি
শিশুর কণ্ঠে নাবলা অনেক কথা।
একুশ তুমি
অ, আ, ক, খ শোভিত শ্লোগান।
একুশ তুমি
লাখো শহীদের রক্তের অবদান।

আহ্বান

-আশরাফুল হক পলাশ
বাথইল, নারায়ণপুর, নওগাঁ।

আজ নতুন যুগের ডাক এসেছে ঝাণ্ডা হাতে চল ছুটে
খোলরে দুয়ার নিদ মহলের ধর তলোয়ার করপুটে।
জাগরে বেহুঁশ মুসলিম যত, জীবন যুদ্ধে হও জয়ী
মুছ আঁখিজল, মরবে কেন মলিন ধূলোর পরতে লুটে?

কোথা সেই আলী, খালেদ-তারেক, মাহমূদ-মূসা-আলমগীর,
করিল বিশ্ব পদানত যাঁরা মুসলিম কেন নোয়াও শীর?
ছেড়ে শাহী তাজ, তবে কেন আজ, ভিখারীর বেশ পরে
নফরীর তরে দ্বারে ফেরো দু'চোখ ভেজাও অশ্রুনীরে?

কুরআন পাকের শাশ্বত বাণী বরিলে সফল যিন্দেগী,
তাওহীদেরই ভিত গড়িতে কালেমা ত্বাইয়েবা করিলে সাথী
তামাম দুনিয়া হে মুসলমান করিবে তোমার বন্দেগী,
নতুন সূর্য উঠিবে আবার বিদূরিত হবে ঘোর রাতি।

প্রগতিতে আয় ভাগ্যাহত মুসলিম এবার ভাঙ্গরে নিন্দ,
তাওহীদের এই পতাকা তলে বাজিছে যুগের ঐক্যবীন!

ভাঙ্গরে যুবক এই সমাজ

-মুহাম্মাদ শরীফ ফেরদৌস
জোংড়া, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

তাক্বলীদের ঐ শিকল ফেলে
কুরআন-হাদীছ বুকে ধরে
চলরে নবীন চল!
এই সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে
নতুন সমাজ নাও গড়িয়ে
এলাহী আইনে গড়ে সমাজ
সদা অহি-র পথে চল
চলরে যুবক চল!
মাযহাবী আর ফির্কাবন্দী
কবরপূজা পীর মুরীদি
এই গোঁড়ামি ভেঙ্গে দিতে
বাঁধরে তোরা দল
চলরে যবুক চল!
শিরক-বিদ'আতে বোঝাই সমাজ
বদলে দিতে চালাও প্রয়াস
ছহীহ হাদীছ দেখিয়ে তাদের
ভুলিয়ে দাও বাপ-দাদার হাল
চলরে যুবক চল!
শবেবরাত আর কুরআনখানী
মীলাদ-ক্বিয়াম আর কুলখানী
কঠোর হাতে করতে দমন
লও হাদীছের বল
চলরে যুবক চল!
হে যুবক! প্রতিফোটা রক্ত তোমার
আমানত যে আল্লাহ তা'আলার
তাঁহার পথে লাগাও তোমার
জান এবং মাল
চলরে যুবক চল!

পর্দায় ঘৃণা

-আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

মেক্সী শাড়ী পরে যারা, মাথা রাখে ঢেকে,
অনেক লোকে দেখে তাদের ঘৃণা করে থাকে।
বোরক্বা-নেকাব পরে যাঁরা পর্দা মেনে চলে,
গেয়ো আর অশিক্ষিত তাদেরকে কে বলে।
নাচের সময় শিল্পীরা যদি গায়ে কাপড় রাখে,
ভাল শিল্পী হয় না সে সবাই বলে থাকে।
বস্ত্র ছাড়া নাচতে হবে গাইতে হবে গান,
সেরা শিল্পী হবে সে এটাই তার প্রমাণ।
নেটি পরে খেলা করে যখন মহিলারা
দর্শকগণ আনন্দেতে হয় যে আত্মহারা।
বস্ত্র ছিল বাধা মোর হেরে গেলাম তাই,
আমার সাথে জিততে পারে এ জগতে নাই।
বস্ত্রহীন শুরু হ'ল সকল প্রকার খেলা,
আইলা আর সিডর আল্লাহ্র লীলাখেলা।
জ্ঞানের আলো প্রচার করে টিভির পর্দায় দেখি,
অনেক দেশের অনেক কিছু আমরা তাতে শিখি।
কুফরী আর নাফরমানিতে ডুবছে মুসলমান,
জাহান্নামে যেতে হবে কুরআন তার প্রমাণ
জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হ'লে কুরআন-হাদীছ মানি,
ইহকালে-পরকালে শান্তি হবে জানি।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জাতীয় বৃক্ষ)-এর সঠিক উত্তর

১। আমগাছ।
২। ভারতীয় উপমহাদেশ ও মায়ানমার।
৩। ১৫ নভেম্বর ২০১০।
৪। ১৫টি যেলায় অধিক জন্মে।
৫। রাতকানা ও অন্ধত্বের মহৌষধ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। ৪০০০; পুনরুল্লেখ সহ ৭২৭৫টি।
২। ৪০০০; পুনরুল্লেখ সহ ৭৫২৬টি।
৩। ৫২৭৫টি।
৪। ৩৯৫৬টি।
৫। নাসাঈতে ৫৭৫৮ ও ইবনু মাজাহ'তে ৪৩৪১টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)

১। কোন কোন হাদীছ গ্রন্থে সংকলিত সবগুলো হাদীছ ছহীহ?
২। সুনানে আবুদাঊদে যঈফ হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৩। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত যঈফ হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৪। সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৫। সুনানে ইবনু মাজাহ'তে বর্ণিত যঈফ হাদীছের সংখ্যা কতটি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। গোলগাল ঘরটা চুনকাম করা
একবার ভেঙ্গে গেলে যায় না আর গড়া।
২। সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ
মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ,
স্বর্ণকায় মনোহর দেহের বরণ
এক পথে করে গতি সেই কোনজন?
৩। পুস্তকে আছে তবু বাস্তবে নাই
খাবারের নাম তার খেতে নাহি পাই।
৪। রাস্তার ধারে গাছটা ফল ধরেছে পাঁচটা
হাযার লোক খেয়ে গেল তবু পাঁচটা রয়ে গেল।
৫। দুই কুলে জাল ফেলে এক কুড়ি দুই ছেলে,
মাছ যদি জালে আসে কেউ কাঁদে কেউ হাসে।

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বানেশ্বর, রাজশাহী ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল মতীন।

কুরআন-হাদীছের বাণী

-হাবীবা সুলতানা
বুলারাটি, সাতক্ষীরা।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা পড় কুরআন,
আর শিখ হাদীছের বিশ্লেষণ।
রাসূলের আদর্শে
গড় সুন্দর জীবন॥
ভাল কাজের মাধ্যমে
কাটাও দিন-রাত।
পরকালে মুক্তির আশায়
পড় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত॥
সব কাজের শুরুতে তোমরা
বল বিসমিল্লাহ।
অহি-র বিধান মান
ভরসা আল্লাহ॥
অন্যায়-অত্যাচার পাপাচারের
হবে প্রতিবাদী
কারণ পাপের সমর্থকও
সমান অপরাধী॥
দলবদ্ধ হয়ে সবাইকে
অহি-র বাণী শোনাও।
নাস্তিক্যবাদের হাত থেকে
দেশ-জাতিকে বাঁচাও॥

***

ভালবাসি

-ছাবিলা ইয়াছমিন মিতা
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

ভালবাসি সবার সাথে
সত্য কথা বলতে
ভালবাসি সারাটা দিন
দ্বীনের পথে চলতে।
ভালবাসি রাত জেগে
ছড়া-কবিতা লিখতে
ভালবাসি সঠিকভাবে
বাংলা ভাষা শিখতে।
ভালবাসি মায়ের হাতের
আদর সোহাগ পাইতে
ভালবাসি সব সময়
আল্লাহ্‌র গান গাইতে।
ভালবাসি বইয়ের পাতার
জ্ঞানের কথা পড়তে
ভালবাসি সবাই মিলে
সুশীল সমাজ গড়তে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ২ জানুয়ারী পর্যন্ত সঊদী আরবের মক্কা মুকাররমার হারাম শরীফে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৯টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে বাংলাদেশের হাফেয আয়নুল আরেফীন প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে হাফেয আরেফীনকে নগদ সাড়ে ১০ লাখ টাকা সমমানের রিয়াল ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। হাফেয আরেফীন ময়মনসিংহ যেলার সদর থানার বাঘমারা এলাকার মাওলানা রফীকুল ইসলাম ও ফাতেমা আক্তারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ঢাকার মহাখালিস্থ জামে'আ ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া মাদরাসা থেকে হিফয সম্পন্ন করেন।

শহরের তুলনায় গ্রামে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে লাগামহীন

শহরের তুলনায় গ্রামে খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। গত নভেম্বরে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার দুই অংকের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। এর আগের মাসে (অক্টোবর) গ্রামে খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ১৪ শতাংশ। এক মাসের ব্যবধানে তা বেড়েছে ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ। যা সেপ্টেম্বরে ছিল ১০ দশমিক ৫১ শতাংশ। 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (বিবিএস) হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী এ চিত্র পাওয়া গেছে। বিবিএসের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ২০০৯ সালের নভেম্বরে গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ শতাংশ। অক্টোবরে ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ; সেপ্টেম্বরে মাত্র ৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের শুরুতে ছিল ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। নভেম্বরে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে (মাসিক) সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ। অক্টোবরে ছিল ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ। নভেম্বরে সার্বিকভাবে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।

সুবনশিরি বাঁধ : বাংলাদেশের নতুন মরণফাঁদ

টিপাইমুখের পর এবার সুবনশিরি বাঁধ বাংলাদেশের জন্য নতুন মরণফাঁদ। সিলেট সংলগ্ন ভারতের আসাম রাজ্যের সুবনশিরি নদীতে এই বাঁধ নির্মিত হচ্ছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। জানা গেছে, আসাম-অরুণাচল সীমান্তে ২০১১-১২ সালের মধ্যে এই বাঁধ নির্মাণ করার কথা। এখানে ২ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পব্যয় আগের ৬ হাযার ২৮৫ কোটি রূপী থেকে ৮ হাযার ১৫৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই বাঁধ নির্মাণের জন্য ২০০৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর নদীশাসন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বিক্ষোভের কারণে আসাম রাজ্য সরকার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছে না। জানা গেছে, এ প্রকল্পের ক্ষতি তুলে ধরে পরিবেশবাদী সংগঠন 'আরণ্যক' গত ডিসেম্বরে গৌহাটিতে 'উত্তর-পূর্ব জলবিবাদ : সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। সভায় ভারতের পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং সমাজকর্মীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দু'দিনব্যাপী এ আলোচনা সভায় সব বিশেষজ্ঞই স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সুবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বনাশ ঘটাবে আর টিপাইমুখ গোটা বরাক উপত্যকাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

২০১০ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৩৩টি; বিএসএফের হাতে নিহত ১০০

বিদায়ী ২০১০ সাথে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৩৩টি, নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৮৫২টি, কারা হেফাযতে মারা গেছে ১৮ জন, সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩০১টি। গত ১ জানুয়ারী ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র (আসক) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১০ সালে পুরো বছর জুড়েই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল নাজুক। গত বছর ১২৭ জন গণপিটুনির শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সংস্থার মতে, ২০১০ সালে ১০০ জন বাংলাদেশী বিএসএফের গুলীতে নিহত হয়েছেন।

বিডিআর বিদ্রোহে ১১ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি

২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। যানবাহনে আগুন, ভাঙচুর, অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট, বিস্ফোরণ, হেলিকপ্টারে গুলি এবং লুণ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী মালামালের মূল্য ধরে ক্ষতির এই হিসাব করা হয়েছে। বিডিআর, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কর্মকর্তারা যৌথভাবে এ হিসাব তৈরি করেন।

জানুয়ারী মাসে ২০৬ খুন

জানুয়ারী মাসে সারাদেশে ২০৬ জন খুন হয়েছে। বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের ডকুমেন্টেশন বিভাগের এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক সহিংসতায় ১৫৭, সাংবাদিক খুন ১, এসিডদগ্ধ করে হত্যা ২, যৌন হয়রানির শিকার হয়ে মৃত্যু ৫, গণপিটুনিতে নিহত ৫, চিকিৎসা অবহেলায় মৃত্যু ২, যৌতুকের কারণে নিহত ৬, বিএসএফের গুলিতে নিহত ৪ এবং গৃহপরিচারিকা নিহত ১ জন। এ সময় ১৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর ৩ জনকে হত্যা করা হয়।

বিদেশ

ব্রিটেনে ইসলাম গ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়েছে

নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও ব্রিটেনে গত কয়েক বছরে নাটকীয়ভাবে দ্বিগুণ হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার। 'ফেইথ ম্যাটার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ব্রিটেনে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা গত এক দশক আগে ১৪ থেকে ২৫ হাযারের মতো থাকলেও বর্তমান গবেষণা বলছে, এর সংখ্যা এখন ১ লাখের উপরে এবং প্রতি বছর এখানে নতুন করে ৫ হাযার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। স্কটিশ ক্যানসাসের অধিবাসীদের ওপর এবং লন্ডনের মসজিদগুলোতে চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে প্রতি বছর ১৪শ'র বেশী ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

২০০৭ সালে সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেনে বোমা ফাটানোর দায় স্বীকার আরএসএস নেতার

গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস) নেতা স্বামী অসীমানন্দ ২০০৭ সালে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করলেন। সেই সঙ্গে তিনি এক বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে ৪২ পাতার স্বীকারোক্তিতে গত ৮ জানুয়ারী জানিয়েছেন, কেবল দিল্লী-লাহোর সমঝোতা এক্সপ্রেস নয়, মালেগাঁও মসজিদ, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ ও আজমীরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর মাযারে বিস্ফোরণের ঘটনায় অনেক হিন্দু সংগঠনই যুক্ত ছিল।

প্রতি তিন মার্কিন মহিলা সেনার একজন যৌন হয়রানির শিকার

প্রতি তিনজন মার্কিন মহিলা সেনার মধ্যে একজন যৌন হয়রানির শিকার। এছাড়া মার্কিন সেনাবাহিনীতে মহিলা সেনা ধর্ষণের অসংখ্য ঘটনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানো হয় না এবং ধর্ষণকারীদের সাধারণত কোন বিচার হয় না বলে জানিয়েছে 'কোপডিংক' নামের মার্কিন যুদ্ধবিরোধী একটি গোষ্ঠী। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের হিসাব থেকে দেখা যায়, ২০০৯ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে ৩ হাযার ২৩০টি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়েছে। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে ১১ শতাংশ। ২০১০ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে ধর্ষণের ঘটনা ৬৪ শতাংশ বেড়েছে বলে পেন্টাগণের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে।

বিশ্বে ৭৬ হাযার উদ্ভিদ প্রজাতি বিপন্ন হওয়ার পথে

বিশ্বের ৩ লাখ ৮০ হাযার উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৭৬ হাযার প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার হুমকির মুখে রয়েছে। প্রতি ৫টির মধ্যে ১টি প্রজাতি বিপন্ন। মানুষের কার্যকলাপই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী বলে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে। ব্রিটেনের বোটানিক্যাল গার্ডেন, 'লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম' এবং 'দ্য ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অব ন্যাচার' (আইইউসিএন) এর বিজ্ঞানীরা এ গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় বলা হয়েছে, বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিগুলোর মধ্যে শতকরা ৩৩ শতাংশ হুমকির মুখে পড়েছে কৃষি উৎপাদনের জন্য জমি নষ্ট করায়। এককভাবে এ কারণটিই সবচেয়ে বেশী দায়ী। এছাড়া অন্যান্য প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি উন্নয়ন, গাছ কাটা এবং গবাদিপশু পালনের জন্য চারণভূমি ব্যবহার।

ডিভোর্সের হার বাড়াচ্ছে ফেসবুক

সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে পাঁচটি বিয়ে বিচ্ছেদের একটির পেছনে কারণ হিসাবে কাজ করছে ফেসবুক। ফেসবুকে এমন সব রগরগে মেসেজ কিংবা ছবি পাঠানো হয়, যা অনেককে অহেতুক উত্তেজিত করে তুলতে পারে। নিজের স্থিতাবস্থায় তখন তার মধ্যে এক ধরনের অনীহা চলে আসে। নিজের স্ত্রী কিংবা স্বামীকে আর ভাল লাগে না। অতিরঞ্জিত বা মিথ্যের মধ্যে আরও সুখ খুঁজে নিতে চায়। ফলে সম্পর্কে শীতলতা এবং পরে তা ভাঙনের দিকে চলে যায়। প্রায় ৬৬% ঘটনার পেছনে রয়েছে এটা। ১৫ শতাংশের পেছনে কাজ করে মাইস্পেস ও ৫ শতাংশের জন্য দায়ী টুইটার।

বিশ্বের প্রতি ৪ জনের মধ্যে একজনকে ঘুষ দিতে হয়

বিশ্বের প্রতি ৪ জন মানুষের মধ্যে একজনকে ঘুষ দিতে হয় এবং ঘুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে আফগানিস্তান। কম্বোডিয়া ও ক্যামেরুন রয়েছে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে। আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। বিশ্বের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জন রাজনৈতিক দলসমূহকে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মত দিয়েছে। বিশ্বের ৮৬টি দেশের ৯১ হাযার মানুষের ওপর চালানো 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' এর জরিপে এ তথ্য উল্লিখিত হয়েছে।

অযোধ্যার ৬৭ একর জমিই রামমন্দিরের জন্য চায় ভিএইচপি

রামমন্দির নিয়ে আবার হুঙ্কার ছাড়ল 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি)। ২ জানুয়ারী পরিষদের সভাপতি অশোক সিংহল দাবী করেছেন, অযোধ্যার বিতর্কিত জমির ৬৭ একরই রামমন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'আপাতত এই দাবীতে রাস্তায় নেমে কোন আন্দোলন হবে না। কারণ আমরা সুপ্রিমকোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। সর্বোচ্চ আদালতের ওপর আমাদের আস্থা আছে'।

বিনাদোষে ৩০ বছর কারাভোগ

ধর্ষণ মামলায় ৩০ বছরের বেশী কারাভোগের পর আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন কর্নেলিয়াস ডুপ্রি জুনিয়র (৫১)। গত ৪ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস শহরের বিচারক অ্যাডামস শুনানি শেষে তার মুক্তির রায় ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৮০ সালে ধর্ষণ ও ডাকাতির অভিযোগে কর্নেলিয়াসকে ৭৫ বছর সাজা দেয়া হয়েছিল। গত বছর তিনি কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পান। পরে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।

মুসলিম জাহান

খাবারে বিষ প্রয়োগ করে ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে

ইহুদীবাদী ইসরাঈল ফিলিস্তীনী নেতা ইয়াসির আরাফাতকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল বলে নতুন এক তদন্ত থেকে জানা গেছে। ইয়াসির আরাফাতের সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা বাসাম আবূ শরীফ বলেছেন, বৃটিশ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন, আরাফাতের খাবারে বিষাক্ত পদার্থ থ্যালিয়াম মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। থ্যালিয়াম হচ্ছে মারাত্মক বিষাক্ত দ্রব্য, যা সাধারণত খাদ্যের মধ্যেই প্রয়োগ করা হয়। ইসরাঈলী সেনারা ইয়াসির আরাফাতকে পশ্চিম তীরের রামাল্লায় যখন তার দফতরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তখন তেলআবিব তার খাদ্য অথবা পানীয়তে এ বিষ প্রয়োগ করে বলে আবূ শরীফ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আরাফাত রহস্যজনক রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিল গায়ানা

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়ানা। গত ১৩ জানুয়ারী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ঐ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ফিলিস্তীন এবং ইসরাঈল উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া সম্প্রতি চিলি ফিলিস্তীনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়ায় ফিলিস্তীন দূতাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন পোষ্টের তথ্য

পাকিস্তানের কাছে ১০০ পরমাণু অস্ত্র আছে

পাকিস্তান গত কয়েক বছর ধরে তার পরমাণু অস্ত্রের মজুদ দ্বিগুণ করেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে। দেশটির পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন নিরাপত্তা বিশ্লেষকের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, চার বছর আগেও পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৬০। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১১০-এ। ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড অলব্রাইটের বরাত দিয়ে ঐ রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তান খুব দ্রুত তাদের পরমাণু অস্ত্রের মজুদ বাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতের ৬০ থেকে ১০০টি পরমাণু অস্ত্র রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক

'বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা'র (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আফ্রিকায় প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে মারা যায় একজন শিশু। এই রোগটিকে প্রতিরোধ করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন টিকা বের হয়নি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক এক বিশেষজ্ঞ টিম গবেষণা করে বের করেছেন, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ অ্যাজিথ্রোমাইসিন ম্যালেরিয়া থেকে শুধু আরোগ্যই করে না, এই অসুখটির বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ শক্তিও গড়ে তোলে। বার্লিনের মাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গবেষক সংক্রমণ জীববিজ্ঞানবিদ ডাঃ ইওহানেস ফ্রিজেন ও তাঁর টিম গবেষণাগারে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।

যুদ্ধে নামবে অদৃশ্য ট্যাঙ্ক

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সামরিক গবেষকরা এমন একটি ট্যাঙ্ক তৈরির পরিকল্পনা করেছেন যা অদৃশ্য থেকেই গোলাবর্ষণ করতে পারবে। জানা গেছে, অদৃশ্য এই ট্যাঙ্ক আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যেই নেমে পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে। অস্ত্রসজ্জিত এই ট্যাঙ্কে ব্যবহার করা হবে 'ই-ক্যামোফ্লেজ' নামের প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে ট্যাঙ্কে ব্যবহৃত হবে 'ইলেকট্রনিক ইঙ্ক' যা ট্যাঙ্কটিকে চোখের আড়ালে রাখবে। উচ্চপ্রযুক্তির সেন্সর লাগানো থাকবে এই ট্যাঙ্কে যা চার পাশের পরিবেশ থেকে ছবি ধারণ করে আক্রমণ করতে পারবে। সমুদ্রের নীচে থাকা স্কুইড যেমন ছদ্মবেশ ধারণ করে বা অদৃশ্য থেকেই হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, ঠিক এমনটিই করবে এই অদৃশ্য ট্যাঙ্কও। এই ট্যাঙ্ক মানুষ চালিত বা মানুষ ছাড়াই চলবে। এতে বিভিন্ন ধরনের মরণাস্ত্রও থাকবে।

শুকনো পানি

পানি স্বাভাবিকভাবে তরল হলেও সম্প্রতি গবেষকরা শুকনো পানি তৈরি করেছেন। এ শুকনো পানির প্রতিটি দানা দেখতে অনেকটা চিনির দানার মতো। গবেষকরা জানিয়েছেন, শুকনো পানির প্রতিটি দানার ভেতরে রয়েছে একবিন্দু পরিমাণ তরল পানি যা ঘিরে আছে সিলিকা বা বালি। তারা আরও জানান, এ শুকনো পানির দানার প্রতিটির মধ্যে ৯৫ শতাংশই তরল পানি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শুকনো পানির দানা বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও এ পানি তরল পানি অপেক্ষা বেশী কার্বন-ডাইঅক্সাইড ধারণ করতে পারে। এছাড়াও শুষ্ক পানিকে মিথেন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণের জন্যও একটি কার্যকর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

আসছে কৃত্রিম গোশত

যুক্তরাষ্ট্রের মাউথ ক্যারোলাইনা মেডিকেল ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম গোশত তৈরির গবেষণা চালাচ্ছেন তারা। শেষ পর্যন্ত গবেষণায় সফলতা এলে বেঁচে যাবে অনেক প্রাণীর জীবন। নেদারল্যান্ডসেও এ ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, এ গবেষণা সফল হ'লে খাদ্য সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মানব শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু চিকিৎসায়ও অভাবনীয় সাফল্য আসবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলুন!

-কুমিল্লা যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

কুমিল্লা ১৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দলীয় সংকীর্ণতা ও মাযহাবী গোঁড়ামি মুসলমানদেরকে আজ শতধা বিভক্ত করেছে। অথচ আমাদের উচিত ছিল একই কাতারে শামিল হয়ে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলা। তিনি দেশের ইসলামপন্থী নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে কোন লাভ হবে না, যতক্ষণ না ঐক্যের মূল সূত্র বা মূলনীতি জাতির সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র ঐক্যের মূলনীতি তুলে ধরেছে। আর তা হচ্ছে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়া। এই একটি শর্ত মেনে নিলেই কেবল বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য সম্ভব। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সঠিক দ্বীন জাতির সামনে তুলে ধরার আন্দোলন। মানুষের সার্বিক জীবনের সমস্ত কর্ম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হ'তে হবে এটাই এ আন্দোলনের মৌলিক দাবী। আর এ জন্যই আমাদের শ্লোগান- আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। তিনি বলেন, নিজেদের মনগড়া আইনে বিগত ৬২ বছর দেশ চলছে। যার পরিণতিতে দেশ ক্রমেই অধঃপতনে যাচ্ছে। অতএব ইহকাল ও পরকালে সত্যিকারের মঙ্গল চাইলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর বিধানের কাছে। তাই আমরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছি, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। তিনি বিগত সরকার কর্তৃক আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান এবং তাদের দায়ের করা মিথ্যা মামলা সমূহ এখনো নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসাইন, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার, ঢাকা যেলার মুবাল্লিগ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং লাকসাম, চাঁদপুর যেলা সহ দূর-দূরান্ত থেকে বহু শ্রোতা রিজার্ভ বাস, মাইক্রোবাস, সিএনজি প্রভৃতি যানবাহন যোগে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাফর ইকরাম।

কুমিল্লা যেলার প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের পাশে আমীরে জামা'আত : সম্মেলনের পরের দিন ১৪ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলার প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে কুমিল্লা শহর থেকে রওয়ানা হন। (১) যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল মতীন সালাফীর কোরপাইস্থ বাসায় সামান্য বিরতির পর তিনি (২) যেলার দেবিদ্বার থানাধীন খিড়াইকান্দি গ্রামের 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও শাখা সভাপতি দীর্ঘদিন যাবত শয্যাশায়ী আলহাজ্জ আব্দুর রহমান মাষ্টারকে দেখার জন্য খিড়াইকান্দি গমন করেন। তিনি কিছু সময় তার পাশে কাটান ও তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে (৩) কাকিয়ারচর পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর ছালাত আদায় করেন। আমীরে জামা'আতের আগমনের সংবাদ শুনে আশপাশের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করার জন্য আসেন। জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সকল মতপার্থক্য ভুলে এলাহী বিধানের আলোকে তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন যাপনের আহ্বান জানান।

ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত সফর সঙ্গীদের নিয়ে (৪)

স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব আব্দুল মান্নান-এর বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সেখান থেকে (৫) তিনি কোরপাই শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অসুস্থ জনাব আব্দুল আযীয ডিলারকে দেখতে তার বাড়ীতে যান। আমীরে জামা'আত কিছু সময় তার পাশে থাকেন এবং তার রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। (৬) অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ 'আন্দোলন'-এর সাবেক নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ (অবঃ) আব্দুছ ছামাদকে দেখতে কাকিয়ারচর মধ্য পাড়াস্থ তার বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে কিছু সময় অবস্থানের পর (৭) বিকাল ৪-টায় তিনি বুড়িচংয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মাগরিবের কিছু পূর্বে তিনি বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন এবং সেখানে আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এ সময় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব রোসমত আলী ছাহেব উপস্থিত ছিলেন। আমীরে জামা'আত তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। উল্লেখ্য যে, জনাব রোসমত আলী অসুস্থতার কারণে টাউনহলের সম্মেলনে যেতে পারেননি। বাদ মাগরিব (৮) তিনি মসজিদ সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কার্যালয়ে কিছু সময় বসেন ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। (৯) অতঃপর আমীরে জামা'আত কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রাম জগতপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। (১০) পথিমধ্যে বুড়িচং বাজার সংলগ্ন প্রবীণ ব্যক্তি বুড়িচং শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ ইদরীস আলী ভূঁইয়া এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদের পিতা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ জনাব আব্দুর রাযযাক মাষ্টারকে দেখতে তাদের বাড়ীতে যান এবং তাদের রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন।

জগতপুর গ্রামে পৌঁছে (১১) প্রথমে তিনি 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি সদ্য প্রয়াত আহমাদ শরীফ-এর কবর যিয়ারত করেন এবং তার বাড়ীতে পৌঁছে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিনি তার ইয়াতীম সন্তানদের কাছে টেনে দো'আ করেন। (১২) অতঃপর একই গ্রামের 'আন্দোলন' শুভাকাঙ্খী কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুবরণকারী জনাব অহীদুর রহমান-এর বাড়ীতে গমন করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। (১৩) অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ ছাহেবের বাড়ীতে গমন করেন এবং (১৪) এলাকাবাসীর অনুরোধক্রমে পার্শ্ববর্তী মাঝিবাড়ী ফুরকানিয়া মাদরাসার উদ্যোগে আয়োজিত ইসলামী জালসায় বক্তব্য পেশ করেন। (১৫) অতঃপর আগের দিন মৃত্যুবরণকারী 'যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী এমরান হোসাইনের পিতা মোশাররফ হোসাইনের কবর যিয়ারত করেন ও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অতঃপর দিনব্যাপী কর্মসূচী শেষ করে স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাত ১০-টায় তিনি কুমিল্লা শহরে পৌঁছেন।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচীতে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শরাফত আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হারুণ ইবনে রশীদ, কুমিল্লা টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আইনুল হক ও আমীরে জামা'আতের দ্বিতীয় পুত্র 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব প্রমুখ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

কেশবপুর, যশোর ৬-৭ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বাদ আছর যেলার মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক প্রমুখ। প্রথম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে পরের দিন আছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

কমিটি গঠন

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্সের ছাত্র হাফেয আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, আব্দুল গণী প্রমুখ। আলোচনা সভায় হাফেয আব্দুল মতীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

নেছারাবাদ, পিরোজপুর ৩ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় নেছারাবাদ উপযেলার আটঘর কুড়িয়ানা ইউনিয়নের সঙ্গীতকাঠী গ্রামের জাবের মিয়ার বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব জাবের মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পিরোজপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। সমাবেশে উপস্থিত মহিলাগণ প্রচলিত মাযহাব ভিত্তিক আক্বীদা ও আমলের তাক্বলীদী বন্ধন ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন যাপনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাবাহী এদেশের একক মহিলা সংগঠন 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র অধীনে সমবেত হয়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনেরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় কালদিয়া মাদরাসার সাফল্য

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১০ সালের ৫ম শ্রেণীর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় 'আন্দোলন পরিচালিত বাগেরহাটের আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা, কালদিয়ার ছাত্ররা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এ পরীক্ষায় ৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন ১ম বিভাগে, ৫ জন ২য় বিভাগে এবং ১ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে মুহাম্মাদ রমযান শেখ ও মুহাম্মাদ অলিউল্লাহ বিশ্বাস ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) অন্যতম সীরাত গ্রন্থ 'আর-রহীকুল মাখতূম'-এর অনুবাদক মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-টায় রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানাধীন মোল্লাপাড়া-ঠাকুরমারা গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তি কাল করেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। তার দু'টি কিডনীই বিকল হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ ৫ বৎসর যাবত তিনি অন্ধ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৫ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী কর্মজীবনে রাজশাহী যেলার শিতলাই আলিম মাদরাসা, তানোর চিনাশো ফাযিল মাদরাসা, রাজশাহী শহরের তালাইমারী দারুল উলূম আলিম মাদরাসার সুপার, সিরাজগঞ্জ যেলার কামারখন্দ সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এবং জামালপুর যেলার আরাম নগর কামিল মাদরাসার হেড মুহাদ্দিছ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পর দিন বেলা ২-টায় মাওলানা ছানাউল্লাহর ইমামতিতে মোল্লাপাড়া-ঠাকুরমারা জান্নাতুল ফেরদৌস গোরস্থানে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত গোরস্থানেই দাফন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর জানাযায় শরীক হন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার ডুমুরিয়া থানাধীন বরুনা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী বিশ্বাস (৬৮) গত ১২ ডিসেম্বর'১০ তারিখ রাত ৯-টায় ব্রেইন স্ট্রোক করে বরুনা বাজারের একটি ক্লিনিকে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বেলা ১১-টায় মাওলানা আল-আমীনের ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী এলকার সাবেক সভাপতি মাওলানা আইনুদ্দীন (৭০) গত ২ ফেব্রুয়ারী'১১ বুধবার দুপুর ২-টায় মহিষালবাড়ী রেল বাজারের নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৩ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। একই দিন বাদ এশা (৮-৩০মিঃ) আব্দুছ ছামাদ সালাফীর ইমামতিতে মহিষালবাড়ী গোরস্থানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত গোরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ হ'তে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়ার কয়েকজন শিক্ষক যোগদান করেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

মতামত

ধর্মীয় ফেৎনা

জগতের মানুষ নানাবিধ ফেৎনায় জর্জরিত। রাজনৈতিক ফেৎনার পর বড় ফেৎনা হচ্ছে ধর্মীয় ফেৎনা। ধর্মীয় ফেৎনা আবহমান কাল হ'তে চলে আসছে। সম্ভবতঃ প্রলয়কাল পর্যন্ত তা চলবে। ফেৎনায় ফেৎনায় জগৎটা ভরে গেছে। আর এজন্য জগত হ'তে শান্তি যেন উধাও হয়ে গেছে। জগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা থাকলেও ফেৎনার মোকাবিলায় তা যেন অতি ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ। মহান আল্লাহ জগতের মানুষকে ফেৎনা হ'তে দূরে থাকার জন্য বলেছেন, 'ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য' *(বাক্বারাহ ১৯১, ২১৭)*। এ আয়াতের মর্ম বুঝতে অসুবিধা নেই। তথাপি বলি, মানুষ হত্যা করা মারাত্মক পাপ। ফেৎনা সৃষ্টি করা সে পাপ হ'তেও অধিক মারাত্মক। কলহ-বিবাদ, বিশৃঙ্খলা, যুলুম-অত্যাচার, অশান্তি, অস্থিতিশীলতা সবই ফেৎনার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক বিশ্বে মানুষের অনেক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তন্মধ্যে কথা বলার অধিকার ও ধর্মের অধিকার অন্যতম। যদিও মহান আল্লাহ্র নিকট একমাত্র ইসলামই প্রকৃত ধর্ম, তথাপি জগতে মানুষের পালিত ধর্মের অভাব নেই। ধর্মের বাণী একজন আরেক জনকে শোনাতে পারে, এতে দোষের কিছুই নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'একটি কথা জানা থাকলে তা অপরকে জানাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। কিন্তু জোর করে কাউকেও ধর্মান্তরিত করা যাবে না। যদি জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা হয়, তাহ'লে ফেৎনার উদ্ভব হবে। তাই ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে, 'ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২৪৬)*।

ধর্মের কথা বলার অধিকার রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃত হ'লেও অবস্থা ভেদে মনে হয়, তা যেন পুরাপুরি স্বীকৃত নয়। এজন্য একজন আরেকজনকে প্রাণখুলে ধর্মের আহ্বান জানাতে পারে না। বর্তমানে ধর্মের আহ্বানে মারাত্মক ফেৎনার সৃষ্টি না হ'লেও অতীতে যে হয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই কমবেশী জানাশোনা আছে। তবুও কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি প্রাপ্তির পর তা প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়ে প্রচার কার্য শুরু করেন, তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ফেৎনা শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘদিনের পালিত শিরকী আমল-আক্বীদার পরিবর্তে তিনি যখন তাওহীদী আমল-আক্বীদার কথা প্রচার করেন, তখনই চরম সংঘর্ষ লেগে যায়। তাঁকে জীবনের তেইশ বছর ধরেই ধর্মীয় ফেৎনার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। দ্বীন প্রচারের আগে তিনি মক্কাবাসীর নিকট অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর চরিত্রগত গুণাবলীর জন্য তারা তাঁকে 'আল-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাঁর আসল নাম হারিয়ে গিয়ে আল-আমীন নামে সমাদৃত হ'তেন। অথচ এহেন ব্যক্তির সত্য দ্বীন প্রচারে ফেৎনার উদ্ভব হয়েছিল। তিনি যদি আল্লাহ প্রেরিত সত্য দ্বীন প্রচারে ব্রতী না হ'তেন, তাহ'লে মক্কাবাসীর সাথে তাঁর কোনই ফেৎনা হ'ত না। মক্কায় দ্বীন প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন। সেখানকার ঘটনা আরো মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। তিনি তায়েফবাসী কর্তৃক চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। ধর্মীয় ফেৎনার কারণেই তাঁকে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে জীবনের শেষ দশটি বছর মদীনাতে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। সেখানেও মক্কাবাসী তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তিনি শুধু একাই মক্কা নগরী ত্যাগ করেননি, তাঁর ছাহাবাদেরকেও মক্কা ত্যাগ করে মদীনাতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

জন্মভূমি ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। নিজ দেশ, স্বজন, পরিচিত পরিবেশ সব ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন স্থানে, নতুন পরিবেশে হিজরত সহজ নয়। এজন্য হিজরতের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রিয় জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে ধর্মের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এ কাজ করেছিলেন। তাঁদের কাছে ইহাকালীন সুখ-শান্তি হ'তে পরকালীন সুখ-শান্তি অনেক গুণ বেশী আকর্ষণীয় ছিল। মদীনাতেও তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে দিন কাটাতে পারেননি। ধর্মীয় ফেৎনার কারণে তাঁদেরকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

এ সভ্যতার যুগেও মানুষের ভুল আমল-আক্বীদার বিপরীতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক দ্বীন প্রচার করতে গেলে চরম ফেৎনায় পড়তে হয়। যাঁরা সঠিক দ্বীনি কথা বলতে বাধা সৃষ্টি করে, তারা নিঃসন্দেহে তৎকালীন মক্কা ও তায়েফবাসীদের দোসর বৈকি?

মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ, ফরয ছালাতের পরে জামা'আতবদ্ধ মুনাজাত, শুক্রবারের দু'আযান, মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানী, চেহলাম, কুরআনখানী, ঈদে মীলাদুন্নবী ইত্যাদি হাযারো বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বললে একশ্রেণীর মানুষের গা জ্বালা করে। তারা দ্বীনের আসল বিষয় মেনে নিতে রাযী নয় বরং দ্বীন বাহির্ভূত বিদ'আতী অনুষ্ঠান করে পকেট গরম করতে ও লোক দেখানো আমল করতে অধিক পসন্দ করে। এজন্য সঠিক দ্বীনি কথা বললে ঐ সকল মানুষের গাত্রদাহ হয়। অথচ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা সকলকেই অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। নইলে নাজাতের আশা করা বৃথা।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের ফলে অনেক পথভোলা মানুষ সঠিক দ্বীনের পথ পেয়েছেন। এ আন্দোলন চালু থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনীত দ্বীন যথাযথভাবে কায়েম হবে বলে বিশ্বাস। হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় বান্দা ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রবর্তিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১): ঈদ ও জুম'আর ছালাতের এক রাক'আত ছুটে গেলে কিভাবে আদায় করতে হবে? অনুরূপভাবে জানাযার ছালাতে তাকবীর ছুটে গেলে করণীয় কী?

-কামারুযযামান
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : ঈদ ও জুম'আর ছালাতের এক রাক'আত ছুটে গেলে পরের রাক'আত পড়ে নিতে হবে। তবে দুই রাক'আতই যদি ছুটে যায় তাহলে চার রাক'আত পড়তে হবে *(বায়হাক্বী, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ইরওয়াউল গালীল ৩/৮১ ও ৮২ পৃঃ)*। জানাযার তাকবীর ছুটে গেলে আদায় করতে হবে না; বরং ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : বিতর ছালাতে কুনূত পড়ার সময় হাত তোলা যাবে কি?

-আতীকুর রহমান
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : হাত তোলা যাবে। ছাহাবায়ে কেরাম হাত তুলতেন *(বুখারী, কুর্রাতুল আইনাইন বিরাফইল ইয়াদাইন, হা/৯৩ ও ৯৫; সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১ পৃঃ; ফাতাওয়া ওছায়মীন ১৪/১৩৬-৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : জানাযার ছালাতে তাকবীর দেয়ার সময় হাত তোলার মারফূ হাদীছ নেই। সুতরাং হাত তোলা যাবে না বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত কি সঠিক হয়েছে?

-আহমাদ
বল্লা, টাঙ্গাঈল।

উত্তর : জানাযার ছালাতের তাকবীর সমূহে হাত উঠানো যায়। কারণ মারফূ' হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে না পাওয়া গেলেও ছহীহ সূত্রে মাওকূফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন আনাস (রাঃ) জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে হাত তুলতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : আল্লাহ্র ৯৯টি নামের হাদীছটি ছহীহ না যঈফ। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : আল্লাহ্র গুণবাচক নাম ৯৯টি মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭)*। তবে যে হাদীছে নামগুলো উল্লেখ রয়েছে সে হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৮৮)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : প্রবাসে চাকুরীর নির্দিষ্ট সময় থাকার কারণে আমরা অনেকেই জুম'আর ছালাত জামা'আতে আদায় করে পারি না। সেই ছালাত কি যোহর হিসাবে জামা'আত করে পড়া যাবে?

- মুয়াযযেম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : উক্ত জুম'আর ছালাত যোহর হিসাবে কূছর করে পড়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত কূছর করার সময় জামা'আতেও পড়তেন। এ মর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৪ ও ১৩৩৮, 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ইক্বামতের উত্তর দিতে হবে কি?

-নাঈম
মুল্লিকপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইক্বামতের জবাব দিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) সাধারণভাবে বলেন, মুয়াযযিন যা বলেন তোমরাও তাই বল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। উক্ত হাদীছে থেকে ইক্বামতের উত্তর দেওয়ার কথা প্রমাণিত হয় *(আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা দ্রঃ)*। তাছাড়া অন্য হাদীছে আযান ও ইক্বামত দু'টিকেই আযান বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*।

উল্লেখ্য যে, 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'-এর জবাবে 'আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলার হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৭০)*। সুতরাং উত্তরে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'-ই বলতে হবে।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : জুম'আর ছালাতের পরে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে হয়। অনুরূপ জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত পড়া যাবে কি?

- ওমর
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্টভাবে চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে নিম্নে দু'রাক'আত পড়তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। আর বেশী পড়ার নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই। যত রাক'আত সম্ভব পড়তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : জুম'আর দুই খুৎবার মাঝে ইমাম মিম্বরে বসে দরূদ পড়েন। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : দুই খুৎবার মাঝে দরূদ কিংবা অন্য কিছু পড়ার কোন প্রমাণ নেই। এটি নতুন সৃষ্টি। সুতরাং উক্ত অভ্যাস বর্জন করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯): সুন্নাত ছালাতের পর তাসবীহ গণনা সহ আয়াতুল কুরসী পড়া যাবে কি?

-শামীমা
বালিয়াডাংগী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যেকোন ছালাতের পর তাসবীহ পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)*। তবে হাদীছে বিশেষভাবে আয়াতুল কুরসী ফরয ছালাতের পরে পড়ার কথা এসেছে *(নাসাঈ আল-কুবরা হা/৯৯২৮; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০) : জনৈক ব্যক্তি কবরে মাটি দেওয়ার সময় নিম্নের দো'আ পড়েন, اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنْ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْـــوَانًا ***। উক্ত দো'আ কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?***

-আরিফুল ইসলাম
শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দো'আটি ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি যঈফ। এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান নামে একজন রাবী আছেন, যিনি সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে যঈফ *(ইবনে মাজাহ হা/১৫৫৩)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি আয়াত দ্বারা সমস্ত রাত্রি ছালাত আদায় করেন? উক্ত কথা কি সঠিক?

-রফীকুল ইসলাম
বাংলা বাজার, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : একদিন এরূপ করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৬২৫, ৪৭৪০; মুসলিম হা/২৮৬০; তিরমিযী ১৪২৩)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত অভ্যাস এরূপ ছিল না।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত এবং মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত মর্মে যে কথা সমাজে চালু আছে তার ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-আমীনুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত এরূপ হাদীছ নেই। তবে এরূপ হাদীছে এসেছে স্বামীই হচ্ছে জান্নাত, স্বামীই হচ্ছে জাহান্নাম *(নাসাঈ কুবরা, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬১২, ১৯৩৪)*। আর মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত এ হাদীছ 'হাসান ছহীহ' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জন্মদিন উপলক্ষে নবজাতক ছেলেকে স্বর্ণের আংটি বা চেইন দেওয়া হয় এবং বিবাহ উপলক্ষে বরকে স্বর্ণালংকার উপহার দেয়া হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মম?

-সামিউল হক্ব
৮০ লেক সার্কাস, ঢাকা-১২০৫।

উত্তর : দিবস পালন শরী'আত সম্মত নয়। উপহার দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ছেলে ছোট হোক আর বড় হোক পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫৪)*। বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়াও বৈধ নয়।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের দাড়ি রাখার অভ্যাস চালু আছে। মুখের কোন্ পর্যন্ত এবং কতটুকু দাড়ি রাখতে হবে?

-যিয়া
স্থলচর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে মাপজোক করে নয়, বরং পরিষ্কার নির্দেশ হ'ল দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। অতএব যতটুকু দাড়ি, ততটুকু ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : অনেক আলেম খাওয়ার সময় সালাম দিতে নিষেধ করেন। এর পক্ষে ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার মোল্লা

মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলমানের পরস্পরের প্রতি যে ৬টি শিষ্টাচারের কথা শরী'আতে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হ'ল, 'সাক্ষাত হ'লে সালাম করা *(নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০)*। এটি খাওয়া ও খাওয়ার বাইরে যেকোন সময়ে হ'তে পারে। এমনকি পেশাবরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলে তিনি পরে তার জওয়াব দিয়েছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*। সালাম না দিলে কাউকে খেতে ডেকোনা' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফাহ হা/১৭৩৬)*। অতএব সালাম দিলে তাকে খেতে ডাকতে হবে ভেবেই হয়তবা অনেকে সালাম দিতে নিষেধ করেন। অথচ এর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : রোগী দেখতে গেলে ৭০ হাযার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু যারা ডাক্তার তারা তো সর্বদা রোগীর পাশে থাকেন তাদের জন্যও কি একই হুকুম?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : ডাক্তারগণ রোগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য রোগীর পার্শ্বে থাকেন। পক্ষান্তরে রোগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তিদের দুনিয়ার কোন স্বার্থ জড়িত থাকে না। তবে ডাক্তারগণ যদি মানবিক তাকীদে ও নেকী হাছিলের শুদ্ধ নিয়তে তাদের দায়িত্ব পালন করেন তাহ'লে তারা নেকী পাবেন; কিন্তু সেটা রোগী দেখতে যাওয়ার মত নয় *(বুখারী ১ম খণ্ড হা/১)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : যে ব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে জেগে উঠে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-হাসান
স্থলচর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হাদীছটি জাল *(যঈফুল জামে' ৫৭৮৭; মওযূ'আত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : হিজড়া পশু কুরবানী করা যাবে কি না?

-এস. কে মুহাম্মাদ মনসুর আলী
কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : কুরবানীর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হ'তে হ'লে প্রাণীকে শারিরীকভাবে নিখুঁত হ'তে হবে *(নাসাঈ হা/৪৩৬৯, মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৬৩, ৬৪, ৬৫)*। তবে শুধু হিজড়া হওয়া মৌলিক কোন ত্রুটি নয়। সুতরাং তা কুরবানী করা বা সাধারণভাবে যবেহ করা বৈধ যদি এর গোশত ক্ষতিকর প্রমাণিত না হয়। এরূপ পশু কুরবানী দেওয়া বা না দেওয়া কুরবানীদাতার রুচির উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : রাশি গণনা করা ও তার প্রতি বিশ্বাস করা কি শরী'আত সম্মত? গণকের দেওয়া আংটি বা পাথর ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : গণকের নিকট গিয়ে রাশি গণনা করা, তার কথা বিশ্বাস করা, তার দেয়া আংটি ও পাথর ব্যবহার করা হারাম। এতে তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হবে না। আর সে হবে নবী (ছাঃ)-এর আনিত বিধানকে অস্বীকারকারী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০) : যে সমস্ত ছালাতে সরবে ক্বিরাআত পড়ার হুকুম রয়েছে, সেই ছালাতগুলো একাকী পড়লে ক্বিরাআত নীরবে পড়া যাবে কি?

-ডাঃ শফীকুল ইসলাম
সদর হাসপাতাল, পাবনা।

উত্তর : নীরবে পড়া যাবে না; বরং একাকী হলেও সরবে পড়তে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪১১ পৃঃ)*। তবে মাসবূক ব্যক্তি নিম্নস্বরে ক্বিরাআত পড়বে। যাতে অন্য মুছল্লীর সমস্যা না হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : জানাযার ছালাত পড়াতে গিয়ে ইমাম ভুল করলে করণীয় কী? এই ভুলের জন্য মুক্তাদী দায়ী হবে কি?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : ইমাম ভুল করে ছালাত শেষ করলে তার জন্য আর কিছু করণীয় নেই। কারণ জানাযার ছালাতে কোন লোকমা নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৭ পৃঃ)*। তাই ইমাম-মুক্তাদী কেউ দায়ী হবেন না।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : কালোজিরার গুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুমাইয়া আহমাদ ছানী
গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর ঃ কালোজিরাতে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫২০)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ মারা গেলে সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য হাদীছে রয়েছে, মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ছাদাক্বা করলে তাও পৌঁছে। এই দুই হাদীছের সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহনাজ পারভীন
রাযগাঁও, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত হাদীছে তার নিজস্ব আমল বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। কিন্তু তার নামে কেউ হজ্জ বা ছাদাক্বা করলে তা তার কাছে পৌঁছবে। কারণ এটা তার করা আমল নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : জনৈকা মহিলার ২ জন মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। সে সমানভাবে দুই মেয়েকে সমস্ত সম্পদ লিখে দিয়েছে। তার উক্ত কাজ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে? বর্তমানে সে মৃত।

-জসীম
মহিষকুড়ি, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কাজটি বৈধ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৬৫, সনদ ছহীহ)*।

কোন ব্যক্তি যদি পুত্র ছাড়া কেবল একটি মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহ'লে সে মেয়েটি তার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর দু'জন বা তদোধিক হ'লে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কন্যাগণের অংশ এর বেশী নেই। বাকীটা আছাবা সূত্রে অন্য উত্তরাধিকারীগণ পাবেন *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : জনৈক আলেম বলেন, যে ইমাম বা খত্বীবের হজ্জ করা ও যাকাত দেওয়ার সাধ্য নেই, তিনি হজ্জ ও যাকাতের আলোচনা করতে পারবেন না। উক্ত দাবী কি ঠিক?

-হাফেয অহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার পক্ষ হ'তে একটি আয়াত জানা থাকলেও তা অন্যকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮, 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : 'বিসমিল্লাহ'র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা যাবে কি?

-রুহুল আমীন
এএফসি, আবুধাবী, দুবাই।

উত্তর : এরূপ সাংকেতিক সংখ্যায় বিসমিল্লাহ লেখা যাবে না। 'বিসমিল্লাহ'-এর শব্দগুলোর বিশেষ গাণিতিক মান বের করে ৭৮৬ সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারীরা মনে করে, এর দ্বারা 'বিসমিল্লাহ'-কে যত্রতত্র অমর্যাদাকর ব্যবহার থেকে রক্ষা করা যায়। এটা নিতান্তই বালসুলভ চিন্তা। 'বিসমিল্লাহ'কে 'বিসমিল্লাহ'-এর জায়গায় রেখেই এর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে; অস্পষ্ট সংকেতে উচ্চারণেই বরং এর প্রতি চরম অবমূল্যায়ন হয়।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : কেউ যদি বলে কুরআনের কসম বা কা'বার কসম তাহ'লে কি শিরক হবে?

-মুহাম্মাদ তালহা খালেদ
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : মানুষ কসম করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামে *(বুখারী হা/৩৮৩৬, মুসলিম হা/৪৩৪৮)*। অন্যের নামে কসম করা শিরক *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৪১৯)*। ইবনুল আরাবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এরূপ শপথ করে, সে ব্যক্তি কাফির। আর যদি কেউ অজ্ঞতার বশে বা নিজের অজান্তে বলে ফেলে, তবে পরক্ষণেই لا اله الا الله বললে তার অন্তর ভুল থেকে সঠিকতার দিকে ঘুরে যায় *(ফাৎহুল বারী হা/৪৫৭৯)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওয়া খালাক্বনা -কুম আযওয়া-জা'। এর দ্বারা কি শুধু মানুষের কথা বলা হয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে এক ব্যক্তি দু'টি বা তিনটি বিয়ে করে কেন? উক্ত আয়াতের ব্যখ্যা সম্পর্কে জানতে চাই।

-ডাঃ আবু আব্দুল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর : এখানে জোড়া জোড়া সৃষ্টির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নর ও মাদী সৃষ্টি করা *(তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : ছালাতে কাতারবন্দী হওয়ার সময় ডান থেকে কাতার করবে না বাম থেকে?

-ডাঃ কামারুযযামান সরকার
তুলাগাঁও, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : ইমামের পিছন থেকে কাতারবন্দি হবে, যাতে ইমাম মাঝখানে হয় এবং তার ডানে ও বামে মুছল্লী সমান হয়। আনাস বিন মালেক বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাত আদায় করলেন। তখন আমি ও আমার ছোট ভাই তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। আমার বৃদ্ধা মা উম্মে সুলায়েম দাঁড়ালেন

আমাদের পিছনে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১০৮)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় কাতারের মুছল্লীরাও ইমামের পিছন থেকে কাতারবন্দি হবে। এক্ষণে ছালাতের দ্বিতীয় কাতারে ডান দিক থেকে দাঁড়ানোর যে প্রথা সমাজে চালু আছে সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : পাশাপাশি দুইটি পৃথক মসজিদের একটিতে পুরুষ ও একটি মহিলা ছালাত আদায় করে থাকে। সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে একই সঙ্গে জামা'আত করা যাবে কি?

-ইউসুফ
জগতপুর, কুমিল্লা।

উত্তর : যাবে। যদি দেখে বা শুনে ইমামের রুকূ, সিজদা, কওমা বুঝা যায় তাহ'লে অন্য মসজিদ বা অন্য স্থান থেকেও জামা'আতে ছালাত আদায় করা জায়েয। মুক্তাদী ও ইমামের মাঝখানে রাস্তা বা দেয়াল থাকলেও কোন দোষ নেই, যদি মুক্তাদী ইমামের তাকবীরে তাহরীমা সহ সব তাকবীর শুনতে পায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শয়নকক্ষে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করেন। কক্ষের বাহির থেকে লোকেরা তাঁর ইক্তেদা করে দুই বা তিন রাক'আত *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, হা/৭২৯, অনুচ্ছেদ-৮০)*।

তবে এজন্য স্থানিক নৈকট্য থাকতে হবে। রেডিও বা টিভির মাধ্যমে ইক্তেদা করে দূরবর্তী স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮০ টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১): জনৈক পাকিস্থানী ইমাম বলেন, ছালাতের পূর্বে টাখনুর নীচের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে অনেকে ছালাত আদায় করে। এতে তার ছালাত হবে না। এর সত্যতা জানতে চাই।

-রুহুল আমীন
এএফসি, আবুধাবী, দুবাই।

উত্তর : মূলতঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা ও ছালাত আদায় দু'টি দুই বিষয়। টাখনুর নীচে কাপড় পরা নিঃসন্দেহে একটি বড় অপরাধ যা বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১)*। সেটা ছালাতের মধ্যে হোক আর ছালাতের বাইরেই হোক। একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য এরূপ দ্বিমুখী আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : তাবলীগের জনৈক মুরব্বী বলেন, আল্লাহ যার প্রতি দিনে দশবার রহমতের দৃষ্টিতে তাকান তার জামা'আতে ছালাত পড়ার সুযোগ হয়। আর যার দিকে ৪০ বার রহমতের দৃষ্টিতে তাকান তার হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়। আর যার দিকে ৭০ বার তাকান তার তাবলীগে যাওয়ার সুযোগ হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক।

-রিপন পারভেজ
কাউলজানী, বাসাইল, টাঙ্গাঈল।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এখানে প্রচলিত বিদ'আতী তাবলীগে যাওয়ার বিষয়টিকে জামা'আতে ছালাত আদায় ও হজ্জ করার চাইতে উত্তম কাজ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব এইসব বিদ'আতীদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। এদের কোন বয়ান শুনবেন না এবং এদের কোন বইও পড়বেন না।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে ও তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জ্ঞান করে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই সাথে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের সুফারিশ কবুল করা হবে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। হাদীছটি তাফসীর মাহফিলে বলা হয়ে থাকে। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই?

-শরীফুল ইসলাম
মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে হাফছ ইবনু সুলায়মান নামক একজন দুর্বল রাবী আছে *(যঈফ তিরমিযী হা/২৯০৫; 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়; মিশকাত হা/২১৪১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে হজ্জ করা ফরয?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ দৈহিক সক্ষমতা থাকলে এবং আর্থিকভাবে কা'বা ঘরে যাওয়া ও আসার সমপরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ওপর হজ্জ ফরয *(আলে ইমরান ৯৭)*। অনেকের উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে অলসতা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে' *(আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৫২৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : চার ইমামের মধ্যে কোন্ কোন্ ইমাম ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন?

-আব্দুল করীম
বড়গাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ছাড়া বাকী তিন ইমাম ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : মানুষ ও জিন যে বয়সে মারা যায় ক্বিয়ামতের দিন কি সেই বয়সেই উঠানো হবে?

-আবুল হুসাইন মিঞা

কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ঐ সময় জান্নাতীদের বয়স ৩০ অথবা ৩৩ হবে *(তিরমিযী হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৬৩৯ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-৫)*। অনুরূপ বয়স হবে জাহান্নামীদের। তবে উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৫৬৪৮)*। জিনদের বয়স কত হবে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে একই রূপ হবে বলে অনুমতি হয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন ইসরাফীল (আঃ) দ্বিতীয় ফুঁৎকার দিবেন তখন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনা বিহীন অবস্থায় উঠানো হবে *(সূরা আম্বিয়া ১০৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৫ ও ৫৫৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে যে মিছিল বা জশনে জুলূসের প্রচলন দেশে রয়েছে তার বিপরীতে একই দিনে যদি সীরাত মাহফিল বা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা সমাবেশ অথবা কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তাতে কি গোনাহ হবে?

-আব্দুল হক

গোয়ালবাজার, সিলেট।

উত্তর : বলার অপেক্ষা রাখে না ঈদে মীলাদুন্নবী একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত, যা ৬০৫ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে ইরাকে প্রথম চালু হয়। তাই এ দিনকে উপলক্ষ করে যা কিছুই করা হোক না কেন তা বিদ'আতী আমল হিসাবে গণ্য হবে *(লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৫৭২৩)*। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী ও তাঁর নির্দেশিত পথ সম্পর্কে জানার জন্য বছরের নির্দিষ্ট কোন দিন নয়, বরং সারা বছরই উন্মুক্ত। এর জন্য বছরের সেই দিনকেই যদি নির্দিষ্ট করা হয় যে দিনটি বিদ'আতী আমল উদযাপনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তবে তাও নিঃসন্দেহে বিদ'আতী আমল হিসাবে গণ্য হবে। সন্দেহ নেই যে, বিদ'আত এমন পাপ যা আল্লাহ্র গযবকে ত্বরান্বিত করে। আর এদিন উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা আরও গোনাহের কাজ।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : ভূমিকম্পের আলামত পশু-পক্ষী জানতে পারে কি?

-সৈয়দ ফয়েয

ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বিষয় সম্পর্কে শারঈ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : যে বিবাহ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গান-বাজনা ও শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয়, সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ

মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : এধরনের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, 'ঐসব লোকদের পরিত্যাগ করুন যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে *(আন'আম ৭০)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : যাদের নেকী ও গুনাহ সমান হবে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?

-তামীমুল ইসলাম

বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করবে। তারাই হবে আ'রাফবাসী *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২৫ পৃঃ, সূরা আ'রাফ ৪৬ ও ৪৭ নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ)*।